মাসিক

আল-আবরার

الأبرار

The Monthly AL-ABRAR

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি: নং- ১৪৫ বর্ষ-২, সংখ্যা-৭

আগস্ট২০১৩ইং, শাওয়াল ১৪৩৪হি:, শ্রাবন ১৪২০বাং

شوال المعظم ١٤٣٤ه اغسطس ٢٠١٣م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

বিনিময়: ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : পর্দা........................ ৪
পবিত্র সুন্নাহ থেকে : শবে ঈদ ৮
হযরত হারদূয়ী (রহ.) এর অমূল্য বাণী ৯
মাওয়ায়েযে ফক্বীহুল মিল্লাত : ইসলামী বিয়ে-৬.... ১০
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ
মাযহাব না মানলে... .... ১৩
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব
মহিলারা মসজিদ ঈদগাহে যাবে কি না?............. ১৭
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল মাদানী
যাকাত : ফাজায়েল, আহকাম ও মাসায়েল ১৯
মুফতী শাহেদ রহমানী
কোয়ান্টাম মেথড-১৬ :
বদলে গেছে লাখো জীবন!! ২৪
মুফতী শরীফুল আজম
হযরত থানভী (রহ.)-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা-৩. ২৯
মুফতী মুহাম্মদ তকী উছমানী
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)............................ ৩৪
মাওলানা আবদুল মজিদ
আল্লামা শাহ ইসহাক (সদর সাহেব হুজুর) রহ...... ৩৬
হাফেজ মাও. রিদওয়ানুল কাদের
আল্লামা কাজি মুতাসিম বিল্লাহ রহ. ৩৯
আবুনাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪১
নবীজী (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-৯.... ৪৪
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত স্মরণী, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন: ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
ইমেইল :monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক:০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯ সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

ঈদ : মহিমান্বিত একটি ইসলামী বিধান

প্রতি বছরই ঈদ আসে। বয়ে আনে আনন্দোৎসবের চেতনা। স্মরণ করিয়ে দেয় এক সফল জীবনের সুসংবাদ। যে জীবনে উন্মুক্ত খুশীর দুয়ার। প্রত্যেকের হৃদয়ে জাগ্রত করে নবোদ্দীপনা। বারো মাস পর এ যেন নবোদ্যম, নতুন উৎফুল্লতা। নতুন বসন ভূষণে সজ্জিত হয়ে যার যার তওফিক অনুসারে সবাই ঘরে ও বাইরে আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে এই ঈদে।

হাদীস শরীফে এসেছে–

'রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদিনাতে আগমন করলেন তখন মদিনা বাসীদের দুটো দিবস ছিল, যে দিবসে তারা খেলাধুলা করত। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন এ দু দিনের কী তাৎপর্য আছে? মদিনা বাসীগণ উত্তর দিলেন, আমরা মূর্খতার যুগে এ দুই দিবসে খেলাধুলা করতাম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ দু দিনের পরিবর্তে তোমাদের এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুটো দিন দান করেছেন। তা হল ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর।' (আবু দাউদ) এই হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়, শুধু খেলাধুলা, আমোদ-ফুর্তির জন্য বর্বরযুগে যে দুটি দিবস ছিল আল্লাহ তা'আলা তা পরিবর্তন করে মানবকুলের জন্য এমন দুটো দিন হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করেছেন, যে দিনে আল্লাহর শোকর, তাঁর জিকির, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার সাথে সাথে শরীয়ত সমর্থিত আমোদ-খুশি, সাজ-সজ্জা এবং খাওয়া- দাওয়া করা যাবে।

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি দু ঈদের দিন সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করতেন। (বায়হাকি)

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন : আমি ওলামাদের কাছ থেকে শুনেছি তারা প্রত্যেক ঈদে সুগন্ধি ব্যবহার ও সাজ-সজ্জাকে মোস্তাহাব বলেছেন। (আল-মুগনি : ইবনে কুদামাহ)

(ঈদের দিনের ফজীলত, আমল ও আহকাম সম্পর্কে বিস্তারিত মাসিক আল-আবরার জুলাই ২০১৩ দ্রষ্টব্য)

আলোচিত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস থেকে ঈদের তাৎপর্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে। তা হল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উম্মতে মোহাম্মদীকে সম্মানিত করে তাদের এ দুটো ঈদ দান করেছেন। আর এ দুটো দিন বিশ্বে যত উৎসবের দিন ও শ্রেষ্ঠ দিন রয়েছে তার সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন ও সেরা ঈদ।

ইসলামের এ দু'টো উৎসবের দিন শুধু পার্থিব আনন্দ-ফুর্তির দিন নয়। বরং এ দিন দুটোকে আনন্দ-উৎফুল্লতার সাথে সাথে মহান প্রতিপালকের ইবাদত-বন্দেগি দ্বারা বিন্যস্ত করা হয়েছে। যে মহান পালনকর্তা জীবন দান করেছেন, দান করেছেন সুন্দর আকৃতি, সুস্থ শরীর, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তানাদি, পরিবার পরিজন, যার জন্য জীবন ও মরণ- তাঁকে এ আনন্দের দিনে ভুলে থাকা হবে আর সব কিছু ঠিকঠাক মত চলবে এটা কি যুক্তিসঙ্গত? তাই ইসলাম আনন্দ-উৎসবের এ দিনটাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত-বন্দেগি, তাঁর প্রতি শোকর-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা সু-সজ্জিত করেছেন।

ইসলামের সোনালীযুগ থেকে যুগের তফাৎ যতই বাড়ছে ততই সমাজে বস্তুবাদিতা, পার্থিব স্বার্থসিদ্ধতা, ধর্মদ্রোহিতা, ধর্মবিমুখতা এবং শরীয়তে ইসলামিয়ার প্রতি উদাসীনতা ভয়ানক হারেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে ইসলাম বিরোধীদের কুটকৌশল, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। মুসলমানদেরকে যত বেশি ধর্মোচ্যুত করা যায় তত বেশি উৎফুল্ল হয় তারা। এই বাস্তবতা নতুন নয় বরং ইসলামের আগমনকাল থেকেই।

তারই অংশ হিসেবে ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে মুসলমানদের মাঝে একান্তই পার্থিব স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়ার মনমানসিকতা সৃষ্টির একটা নীলনকশা বাস্তবায়িত হচ্ছে দীর্ঘ দিন থেকে। বর্তমান আধুনিক যুগে মুসলমানদের মাঝে এরূপ হীনপ্রবণতার অনুপ্রবেশ করছে ব্যাপক হারে। যেমন রোযা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। রোযার সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান হলো সাহরী খাওয়া, ইফতার করা। সবই ইবাদত। সবই শরয়ী বিধান। কিন্তু বর্তমানে ইফতারের বিধানকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে লোক দেখানো ইফতার মাহফিল রূপে। যাতে অনেক প্রকার ইসলাম বিরোধী কাজও সংঘটিত হতে দেখা যায়। এসবের সাথে ইসলামেরই বা কি সম্পর্ক!

এমনিভাবে 'ঈদ' ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এটি ইবাদত। বরং অন্যান্য দিনের ইবাদতের চেয়ে ঈদের দিন ও রাতের ফজীলত অনেক বেশি। কিন্তু বর্তমানে ঈদকে বিভিন্ন জাতির উৎসবের দিনের মত করে পালন করার একটা প্রবণতা দেখা যায় মুসলিম সমাজের বিভিন্ন অংশে। তারা ঈদকে নিতান্তই একটি খুশি ও উৎফুল্লের উৎসব ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। এক

শ্রেণীর লোক ঈদকে শুধু খুশী ও উৎসবের দিন হিসেবে প্রচার করার কাজে লিপ্ত। তারা কোনো সময় বলে না এটি একটি ইসলামের স্বতন্ত্র বিধান, গুরুত্বপূর্ণ হুকুম। সে কারণে দেখা যায় রমাজান মাসের মত পবিত্র মাসেও ঈদ বাজারের নামে বিভিন্ন প্রকার বেহায়াপনা মাথাছড়া দিয়ে ওঠে। দেশের সর্বত্র নারী পুরুষের অবাধে মিলন মেলায় পরিণত মার্কেট, শপিং মল, ঈদবাজার। যার দ্বারা স্বয়ং রমাজানের পবিত্রতা তো ব্যহত হয়ই, ঈদটাকে অন্যান্য জাতির উৎসবের মত একটি নিতান্তই পার্থিব উৎসবের দিবসে পরিণত করা হয়। কাজে কর্মে এটি যে, ধর্মীয় একটি বিধান পালন তার চিহ্নও থাকে না। বর্তমানে মুসলানদের মাঝে এমন পরিবারেরও খোঁজ পাওয়া যায় যারা ধর্মকর্মতো মানেই না বরং ধর্মের বিরোধিতায় পঞ্চমুখ, কিন্তু ঈদ এলে সত্যিই উৎসব করে। একারণেই হয়ত তারা মুসলমান।

অনেক প্রিন্ট মিডিয়া বড় কলেবরে ঈদ সংখ্যা প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু তাতে ইসলামের ঈদের কোনো কথা থাকে না। ঈদের পরিচয়টা পর্যন্ত পাওয়া যায়না ওসব ম্যাগাজিনে। অথচ নাম দেওয়া হয় 'ঈদ সংখ্যা'।

বিভিন্ন স্যাটেলাইট মিডিয়া ঈদ উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল ও উলঙ্গপনায় ভরা নাটক ফিল্ম ইত্যাদি প্রচার করে ঈদের মত পবিত্র রজনি ও দিবসকে কলুষিত করে থাকে। এই হলো আমাদের কিছু অংশের ঈদ পালনের নমুনা। এগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রেরই বহিঃপ্রকাশ।

এই ধারা অব্যহত থাকলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একসময় হয়ত নবপ্রজন্মরা ঈদের স্বার্থকতা এবং ঈদ নামের ধর্ম পালনের মূখ্য উদ্দেশ্য থেকেও বঞ্চিত হয়ে যেতে পারে।

মুসলমানদেরকে ধর্মীয় যে কোনো বিধানের ব্যাপারে ইসলামদ্রোহীদের এহেন ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। মুসলিম উম্মাহকে ধর্মীয় ব্যাপারে আরো সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করতে এসবের বেশি বেশি আলোচনা করা আবশ্যক। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামী বিধানগুলো সঠিকভাবে উপলব্ধি করে গুরুত্বসহকারে পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আরশাদ রহমানী, ঢাকা
২৬-০৭-২০১৩

শায়খুল হাদীস আল্লামা ইসহাক (সদর সাহেব হুজুর) এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা কাজি মুতাসিম বিল্লাহর ইন্তিকালে

মাসিক আল-আবরারের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান-এর শোক

জাতি দুজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীনকে হারিয়েছে

জামিয়া দারুসসুন্নাহ হিলা, কক্সবাজারের শায়খুল হাদীস প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ হযরত মাওলানা ইসহাক (সদর সাহেব হুজুর) রহ.- এবং জামিয়া শরঈয়্যা মালিবাগ ঢাকার স্বনামধন্য মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা কাজি মু'তাসিম বিল্লাহর ইন্তিকালে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক, সম্মিলিত কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (দামাতবারাকাতুহুম) পৃথক পৃথক শোক বার্তায় বলেন, তাঁদের ইন্তিকালে পুরো জাতি দুজন যোগ্য অভিভাবক এবং প্রখ্যাত আলেমে দ্বীনকে হারিয়েছে। তাঁরা ইলমে নববী তথা হাদীস শাস্ত্রে এক এক জন উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তাঁদের বিশাল ইলমী খিদমাত মুসলিম উম্মাহের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন জাতির এহেন দূরদিনে এসকল মুরব্বী আলেমদের বিয়োগ নিশ্চয় জাতির জন্য বড়ই ক্ষতির সংকেত। আল্লাহ যেন মুসলিম উম্মাহকে নি'মাল বদল দান করেন। তিনি তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

হযরত ফক্বীহুলমিল্লাত (দা. বা.) হযরত কাজি সাহেবের ইন্তিকালের খবর পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। নিজের অসুস্থতা সত্বেও তাহলীল, খতমে কুরআন ও দু'আ মাহফিলের ব্যবস্থা করেন। হযরত সদর সাহেবের ইন্তিকালের সময় হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) উমরা পালনে সৌদী আরবে ছিলেন। হযরতের ইন্তিকালের খবর পেয়ে সেখান থেকে ফোন করে মাদরাসা সমূহে তাহলীল, কুরআন খতম এবং দু'আর ব্যবস্থা করেন।

তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করেন, আল্লাহ যেন মরহুম প্রখ্যাত আলেমদ্বয়কে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, ভক্ত, অনুরক্ত, ছাত্রদের সবরের তাওফীক দান করেন।

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون

৩১. ঈমান আনয়নকারিণী নারীদেরকে বল তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতিত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে, হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঈমান আনয়নকারিণী নারীদেরকে হুকুম করছেন যাতে মর্যাদাশীল পুরুষদের মনে সান্ত্বনা আসে এবং অজ্ঞতাযুগের জঘন্য প্রথার অবসান ঘটে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আসমা বিনতে মুরসিদ (রা.) এর বাড়ীটি বনু হারিসার মহল্লায় ছিল। তার কাছে স্ত্রীলোকেরা আগমন করতো এবং তখনকার প্রথা অনুযায়ী তাদের পায়ের অলংকারাদি এবং বক্ষ ও চুল খুলে রাখা অবস্থায় আসতো। হযরত আসমা (রা.) বলেন, "এটা কতই না জঘন্য প্রথা!" ওই সময় এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

সুতরাং নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, মুসলমান নারীদেরকেও তাদের চক্ষু নিম্নমুখী রাখতে হবে। স্বামী ছাড়া আর কারো দিকে কাম দৃষ্টিতে তাকানো চলবে না। অপরিচিত লোকের দিকে তো তাকানোই চলবে না, কাম দৃষ্টিতেই হোক অথবা এমনিই হোক।

হযরত উম্মে সালমা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এবং হযরত মায়মুনা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট ছিলেন এমন সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) তথায় আগমন করেন। এটা ছিল পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বললেন,"তোমরা পর্দা কর।" তারা বললেন "হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! উনি তো অন্ধ লোক। তিনি আমাদেরকে দেখতেও পাবেন না এবং চিনতেও পারবেন না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "তোমরা তো অন্ধ নও যে তাকে দেখতে পাবে না?"(এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন)

তবে কোন কোন আলেম বলেন যে, কাম দৃষ্টি ছাড়া তাকানো হারাম নয়। তাদের দলীল হলো ওই হাদীসটি যাতে রয়েছে যে, ঈদের দিন হাবশী লোকেরা অস্ত্রের খেলা দেখাচ্ছিল। ওই সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আয়েশা (রা.) কে তার পিছনে দাঁড় করিয়ে দেন। তিনি তাদের খেলা দেখছিলেন এবং মনভরে দেখার পর ক্লান্ত হয়ে চলে আসেন।

স্ত্রীলোকদেরকেও সতীত্ব রক্ষা করে চলতে হবে। নিজেদের আভরণ কারো সামনে প্রকাশ করা যাবে না। পর পুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্যের কোন অংশই প্রকাশ করা যাবে না। হ্যাঁ, তবে যেটা ঢেকে রাখা সম্ভব নয় সেটা অন্য কথা। যেমন চাদর ও উপরের কাপড় ইত্যাদি। এগুলোকে গোপন রাখা স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্ভব নয়। এটাও বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি এবং আংটিকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু হতে পারে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই সৌন্দর্যের স্থান যেটা প্রকাশ করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। হযরত আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা যেন নিজেদের আভরণ প্রকাশ না করে' এর অর্থ হলো, তারা যেন তাদের বালি, হার, পায়ের অলংকার ইত্যাদি প্রদর্শন না করে।

বর্ণিত আছে যে, আভরণ অর্থাৎ অলংকার বা আকর্ষণীয়

পোশাক দুই প্রকারের রয়েছে। এক তো হলো ওটাই যা শুধু স্বামীই দেখে। যেমন আংটি ও কংকন। আর দ্বিতীয় আভরণ হলো ওটাই যা অপরও দেখে থাকে। যেমন উপরের কাপড়।

যুহরী (রহ.) বলেন যে, এই আয়াতে যেসব আত্মীয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাদের সামনে কংকন, দোপাট্টা এবং বালি প্রকাশিত হয়ে গেলে কোন দোষ নেই। আর অপর লোকদের সামনে যদি শুধু আংটি প্রকাশ পায় তবেও কোন দোষ হবে না। অন্য রেওয়ায়েতে আংটির সাথে পায়ের মলেরও উল্লেখ রয়েছে। হতে পারে যে, مـاظهـر مـنهـا এর তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ গুরুজন মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জি করেছেন। যেমন সুনানে আবি দাউদে রয়েছে যে, একদা হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আগমন করেন। ঐ সময় তিনি পাতলা কাপড় পরিহিতা ছিলেন। তাকে এভাবে আসতে দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন "নারী যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে যায় তখন ওটা এবং ওটা ছাড়া অর্থাৎ চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া তার আর কোন অঙ্গ দেখানো উচিত নয়।" (এ হাদীসটি মুরসাল। খালেদ ইবনে দারীক এটা হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার হযরত আয়েশার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া প্রমাণিত নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।)

মহান আল্লাহ বলেন, তারা যেন তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। এর ফলে বক্ষ ও গলার অলংকার ঢাকা থাকবে। অজ্ঞতার যুগে তাদের এ অভ্যাস ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাদের বক্ষের উপর কিছুই দিতো না। মাঝে মাঝে গ্রীবা, চুল, বালি ইত্যাদি সবই পরিষ্কারভাবে দেখা যেতো। অন্য আয়াতে রয়েছে, "হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল-তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়; এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।"

خُمُر শব্দটি خمار শব্দের বহুবচন। প্রত্যেক ওই জিনিসকে خمار বলা হয় যা ঢেকে ফেলে। দো পাট্টা মাথাকে ঢেকে ফেলে বলে ওটাকেও خـمـار বলা হয়। সুতরাং স্ত্রীলোকদের উচিত যে, তারা যেন নিজেদের ওড়না দিয়ে বা অন্য কোন কাপড় দিয়ে তাদের গ্রীবা ও বক্ষকে আবৃত করে রাখে।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা ওই স্ত্রীলোকদের উপর রহম করুন যারা প্রথম প্রথম হিজরত করেছিল। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন তারা নিজেদের চাদর ফেড়ে দোপাট্টা বানিয়েছিল। কেউ কেউ নিজের তহবন্দের পার্শ্ব কেটে নিয়ে ওটা দ্বারা মাথা ঢেকে নেয়।

একবার স্ত্রীলোকেরা হযরত আয়েশা (রা.) এর সামনে কুরাইশ মহিলাদের ফযীলত বর্ণনা করতে শুরু করলে তিনি বলেন "তাদের ফযীলত আমিও স্বীকার করি। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আনসার মহিলাদের অপেক্ষা বেশি ফযীলত আমি কোন মহিলার দেখিনি। তাদের অন্তরে আল্লাহর কিতাবের সত্যতা ও এর উপর পূর্ণ ঈমান যে রয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। সুরায়ে নূরের আয়াত وليضـربـن بـخـمـرهن যখন অবতীর্ণ হয় এবং তাদের পুরুষ লোকেরা তাদেরকে এটা শুনিয়ে দেয় তখন এ মুহূর্তে তারা ওই আয়াতের উপর আমল করে। ফজরের নামাযে তারা হাজির হলে দেখা যায় যে, সবারই মাথায় দোপাট্টা বিদ্যমান রয়েছে। দেখে মনে হয় যেন তাদের মাথার উপর বালতি রাখা আছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ওই পুরুষ লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যাদের সামনে নারীরা থাকতে পারে। খুব সাজসজ্জা ছাড়া লজ্জাবনতা অবস্থায় তাদের সামনে তারা যাতায়াত করতে পারে। যদিও বাহ্যিক কোন আভরণের উপর তাদের দৃষ্টি পড়ে যায় তবে এতে কোন অপরাধ হবে না। তবে স্বামী এর ব্যতিক্রম। কেননা নারী তার সামনে পূর্ণ সাজসজ্জার সাথে থাকতে পারবে। চাচা ও মামার সাথেও বিবাহ নিষিদ্ধ, তথাপি তাদের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি, এর কারণ এই যে, তারা হয়তো তাদের ছেলেদের সামনে তাদের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ভাগিনেয়ীদের সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। এজন্যই তাদের সামনেও দোপাট্টা বাঁধা ছাড়া আসা উচিত নয়।

এ আয়াতে নারীদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমান নারীরা পরস্পরের সামনে নিজেদের আভরণ প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু অমুসলিম নারীর সামনে মুসলিম নারী তার আভরণ প্রকাশ করতে পারে না। এই কারণ এই যে, খুব সম্ভব ওই অমুসলিম নারীরা তাদের স্বামীদের সামনে ওই মুসলিম নারীদের সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। মুসলিম নারীদের ব্যাপারেও এই আশংকা আছে বটে, কিন্তু শরীয়ত এটা হারাম করে দিয়েছে বলে তারা

এরুপ করতে পারে না। কিন্তু অমুসলিম নারীকে এর থেকে বাধা দিবে কিসে?

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "কোন নারীর জন্য বৈধ নয় যে, সে অন্য নারীর সাথে মিলিত হয়ে তার সৌন্দর্যের বর্ণনা তার স্বামীর সামনে এমনভাবে দেয় যেন তার স্বামী ওই নারীকে স্বয়ং দেখতে রয়েছে। (এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) তাখরীজ করেছেন।)

হযরত হাসির ইবনে কায়েস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) কে লিখেন, "আমি অবগত হয়েছি যে, কোন কোন মুসলিম নারী গোসল খানায় যায় এবং তাদের সাথে মুশরিকা নারীরাও থাকে। কোন মুসলিম নারীর জন্যে বৈধ নয় যে, সে নিজের দেহ কোন অমুসলিম নারীকে প্রদর্শন করে। (এটা সাঈদ ইবনে মানসূর (রহ.) তার সুনানে বর্ণনা করেছেন।)

হযরত মুজাহিদও (রা.) اونساء هن এর তাফসীরে বলেন যে, এর দ্বারা মুসলিম নারীদেরকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং তাদের সামনে ওই আভরণ প্রকাশ করা যাবে যা মুহরিম আত্মীয়দের সামনে প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ গ্রীবা, বালি এবং হার। অতএব, মুসলিম নারীর জন্যে উলঙ্গ মাথায় মুশরিকা মহিলার সামনে থাকা বৈধ নয়।

হযরত আতা (রা.) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবীগণ যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছেন তখন স্ত্রীদের ধাত্রী তো ইয়াহুদী ও খৃষ্টান মহিলারাই ছিল। যদি এটা প্রমাণিত হয় তবে বুঝতে হবে যে, এটা প্রয়োজন বশতঃ ছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। তবে মুশরিকা নারীদের মধ্যে যারা বাঁদী বা দাসী তারা এই হুকুম বহির্ভুত।

পুরুষদের মধ্যে যারা যৌন কামনা রহিত তাদের সামনেও আভরণ প্রকাশ করা যাবে। অর্থাৎ কাজ কামকারী নওকর চাকরদের মধ্যে যাদের পুরুষত্ব নেই, স্ত্রীলোকদের প্রতি কোনই আকর্ষণ নেই তাদের হুকুম মুহরিম আত্মীয় পুরুষদের মতই। অর্থাৎ এসব আভরণ তাদের সামনে প্রকাশ করা চলবে। কিন্তু সেই খোজা, যার মুখের ভাষা খারাপ এবং সদা মন্দ কথা ছড়িয়ে বেড়ায় সে এই হুকুম বহির্ভুত।

হযরত উম্মে সালমা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন খোজা লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাড়ীতে আসে। তার পবিত্র স্ত্রীগণ এই আয়াতের মর্মানুযায়ী লোকটিকে আসতে নিষেধ করেননি। ঘটনাক্রমে ওই সময়েই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসে পড়েন। ওই সময় সে হযরত উম্মে সালমা (রা.) এর ভাই হযরত আবদুল্লাহ (রা.) কে বলছিল "আল্লাহ তা'আলা যখন তায়েফ জয় করাবেন তখন আমি তোমাকে গায়লানের মেয়ে দেখাবো। সে যখন আসে তখন তার পেটের উপর চারটি ভাজ পড়ে এবং যখন ফিরে যায় তখন আটটি ভাজ দৃষ্টিগোচর হয়।" তার এ কথা শোনা মাত্রই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "সাবধান! এরূপ লোককে কখনো আসতে দিবে না।" অতঃপর তাকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সে তখন বায়দা নামক স্থানে বসবাস করতে থাকে। প্রতি শুক্রবারে সে আসতো এবং লোকদের কাছ থেকে পানাহারের কিছু জিনিস নিয়ে চলে যেতো।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের সামনে থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যারা এখনো স্ত্রীলোকদের বিশেষ গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। স্ত্রীলোকদের প্রতি যাদের লোলুপ দৃষ্টি এখনো পতিত হয় না। হ্যাঁ, তবে যদি তারা এমন বয়সে পৌঁছে যায় যে, স্ত্রীলোকদের সুশ্রী হওয়া বা বিশ্রী হওয়ার পার্থক্য তারা বুঝতে পারে এবং তাদের সৌন্দর্যে তারা মুগ্ধ হয়ে যায় তবে তাদের থেকেও পর্দা করতে হবে। যদিও তারা পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ না করে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, " তোমরা স্ত্রীলোকদের নিকট প্রবেশ করা হতে বেঁচে থাকো।" প্রশ্ন করা হলো-"হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! দেবর ও ভাসুর সম্পর্কে আপনার মত কি?" উত্তরে তিনি বলেন- "দেবর ও ভাসুর তো মৃত্যু (সমতুল্য)।"

এরপর মহান আল্লাহ বলেন, স্ত্রীলোকেরা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। অজ্ঞতার যুগে এরূপ প্রায় হতো যে, স্ত্রীলোকেরা চলার সময় যমীনের উপর সজোরে পা ফেলতো যাতে পায়ের অলংকার বেজে উঠে। ইসলামে এরূপ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং নারীদেরকে প্রতিটি এমন কাজ থেকে নিষেধ করে দেয়া হয় যাতে তাদের গোপন আভরণ প্রকাশ পেয়ে যায়। তাই তার জন্যে আতর ও সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হওয়াও নিষিদ্ধ।

হযরত আবু মূসা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- "প্রত্যেক চক্ষু ব্যভিচারী, যখন নারী আতর মেখে, ফুল পরে, সুগন্ধি ছড়িয়ে পুরুষদের কোন মজলিসের পার্শ্ব দিয়ে গমন করে তখন সে এরূপ এরূপ (অর্থাৎ ব্যভিচারিণী)।" (এ হাদীসটি ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক নারীর সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে যে সুগন্ধি ছড়িয়ে চলছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ তুমি কি মসজিদ হতে আসছো? সে উত্তরে বললো হ্যাঁ। পুনরায় আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি সুগন্ধি মেখেছো? জবাবে সে বললো হ্যাঁ। আমি তখন বললাম, আমি আমার বন্ধু আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ এমন স্ত্রীলোকের নামায কবুল করেন না যে এই মসজিদে আসার জন্য সুগন্ধি মেখেছে, যে পর্যন্ত না সে ফিরে গিয়ে অপবিত্রতার গোসলের ন্যায় গোসল করে।" (এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন)

হযরত মায়মূনা বিনতে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "অবস্থানে সৌন্দর্য প্রকাশকারিণী নারী কিয়ামতের দিনের ওই অন্ধকারের মত যেখানে কোন আলো নেই।" (এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন।)

হযরত আবু উসাইদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পথে পুরুষ ও নারীদেরকে একত্রে মিলে মিশে চলতে দেখে বলেন "হে নারীরা! তোমরা এদিকে ওদিকে হয়ে যাও। মাঝপথ দিয়ে চলা তোমাদের জন্যে শোভনীয় নয়।" তাঁর এ কথা শুনে নারীরা দেয়াল ঘেষে চলতে শুরু করে। এমনকি দেয়ালের সাথে তাদের কাপড়ের ঘর্ষণ লাগছিল। (এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন।)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। আমার বাতলানো গুণাবলীর অধিকারী হয়ে যাও। অজ্ঞতার যুগের খারপ অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ কর। তাহলেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

ঈদের রজনীর ফজীলত

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য দুটি খুশির দিন ধার্য করেছেন। অর্থাৎ দুই ঈদের দিন। এই দিনগুলো মানবজাতির খুশির জন্য হলেও এগুলো কোনো সচরাচর দিবস পালনের ন্যায় অহেতুক কিছু নয়। বরং এই দিনগুলোতে আল্লাহ প্রদত্ত সকল কাজই ইবাদত। বরং অন্যান্য দিনের চেয়ে এই দিন ও রাতের আমলের ফজীলত অত্যধিক। হাদীস শরীফে এসেছে :

مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ العِيْدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلّٰهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْب.

ابن ماجه، السنن، كتاب الصيام، باب فيمن قام فى ليلتى العيدين، ٢/٣٧٧ : رقم :١٧٨٢

যে লোক দুই ঈদের রাত্রিতে ইবাদতের নিয়তে রাত জাগরণ করবে, তার অন্তর সে দিনও মৃত্যুবরণ করবে না, যেদিন সকল লোকের অন্তর মৃত্যুবরণ করবে। (ইবনে মাজাহ ২/৩৭৭, হাদীস নং ১৭৮২)

مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِى الْخَمْسَ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ :لَيْلَةَ التَّرْوِيَة، وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ، وَلَيْلَةَ النَّحْرِ، ولَيْلَةَ الْفِطْرِ، وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ .منذرى، الترغيب والترهيب،١/١٨٢

পাঁচটি রাতে যে লোক ইবাদত করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত আবশ্যক করে দেবেন। ১. ৮ জিলহজ্জা, ২. ৯ জিলহজ্জা ৩. ১০ জিলহজ্জা, ৪. ঈদের রাত্র শাবানের ১৫ তারিখের রাত। (আততারগীব ওয়াত্তারহীব ১/১৮২)

আরেক হাদীসে আছে, এমন পাঁচটি রাত আছে, যে রাতে কোনো দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। রাতগুলো হলো–

১. জুম'আর রাত। ২. রজব মাসের প্রথম রাত। ৩. শা'বান মাসের ১৫ তারিখের রাত। ৪. ঈদুল ফিতরের রাত। ৫. ঈদুল আজহার রাত।

বর্ণিত হাদিসগুলোয় ঈদের রাতসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাতগুলোর অন্যতম। উপরে বর্ণিত হাদিসগুলো ছাড়াও আরো অসংখ্য হাদিসে ঈদের রাতে ইবাদতের গুরুত্ব ও ফজীলত বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লিখিত হাদীসে বলা হয়েছে, যেদিন মানুষের অন্তর মারা যাবে, সেদিন ঈদের রাতের ইবাদতকারীর অন্তর মরবে না। হাদিসের মর্মার্থ হলো, কেয়ামতের ভয়াবহ তাণ্ডবের সময় প্রতিটি মানুষের অন্তর যখন হাশরের ময়দানে ভয় আশঙ্কা অস্থিরতায় মৃতপ্রায় হয়ে থাকবে। মানুষের হুশ-জ্ঞান বলতে কিছু থাকবে না। ঈদের রাতে আমলকারী ব্যক্তিদের হৃদয় সে অবস্থাতেও সজীব ও সতেজ থাকবে। সেদিন তার অন্তর মারা পড়বে না। বরং সদা প্রফুল্ল থাকবে। ঈদের রাতের আরেকটি বড় প্রাপ্তি হলো, এ রাতে দোয়া কবুল করা হয়। কোনো দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। বরং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তা সরাসরি কবুল হয়। তাই আমরা আমাদের ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে ঈদের রাতে আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের প্রয়োজনগুলো চাইতে পারি। আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, কবরের আজাব থেকে মুক্তি, জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই চেয়ে নিয়ে পরদিন সকালে একেবারে নিষ্পাপ মাসুম বাচ্চার মতো পবিত্র ঈদের মাঠে আল্লাহর পুরস্কার গ্রহণ এবং প্রতিদান লাভ করতে পারি। এটি মানবজাতির জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুযোগ।

অথচ আমরা পটকা ফুটানো, আতশবাজি, হৈ-হুল্লোড় আর দাপাদাপিতে পার করে দিই আমাদের ঈদের রাত। অনেকে সারা রাত মার্কেটিং করে শেষ করি। কিন্তু একবারও আল্লাহর ইবাদতের কথা মনে করি না। একজন মুসলমানের জন্য এমনটি কখনও কাম্য হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ঈদের রাতে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মাসিক আল-আবরারের সার্কুলেশন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে এখন থেকে নিম্নোক্ত নাম্বারে যোগাযোগের অনুরোধ রইল। (কর্তৃপক্ষ)

০১১৯১-৯১১২২৪
(হাফেজ আখতার হুসাইন)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

তালিবে ইলমদের উদ্দেশে কিছু নসিহত :

১। ছাত্র যামানায়, স্বাস্থ্য ও অবসরকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করতে হবে। কেননা এসব জিনিস অত্যন্ত মূল্যবান। যদি খেলাধুলায় এ সুযোগটি নষ্ট করা হয় তাহলে পরবর্তীতে আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। বরং আফসোস করতে হবে।

২। যার কাছ থেকে দ্বীনি অথবা পার্থিব লাভ অর্জন করতে চাও তার সামনে নিজেকে মিটিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ আপন শান, মান, বড়ত্ব সবই ভুলে যেতে হবে। আদব, আনুগত্য ও খিদমতকে স্বীয় প্রতীক বানাতে হবে। আগ্রহের সাথে পড়ালেখায় মনোনিবেশ করতে হবে। পঠিত অংশ পুরোপুরি মুখস্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। এসব কাজের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ উস্তাদ এত মেহেরবান ও খুশি হবেন যে, অর্থ খরচ করেও যা করা যাবে না।

৩। কথায় বা কাজে কোনো ভুল হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় ভুল স্বীকার করে নেওয়া আবশ্যক। কথার মধ্যে বানোয়াটি মানোভাব পরিহার করতে হবে। কারণ এটা অহংকারের আলামত।

৪। যার কাছে লেখাপড়া করবে তাঁর মহব্বত-আনুগত্য ও আদবের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখবে। এর দ্বারা অনেক উপকার হবে।

৫। ইলমের ওপর বড়াই করবে না। বরং নেয়ামত মনে করে শোকর আদায় করতে থাকবে। অন্যথায় নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হবে। অনেক আলেমের মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতে খারাপ হয়ে গেছে এবং সম্পূর্ণ ইলম ভুলে গেছে।

৭। ছাত্রদের উচিত আল্লাহ ওয়ালা বনে থাকা। তাহলে সব জিনিস তার জন্য হয়ে যাবে। যদি কেউ আল্লাহ তা'আলা থেকে বিমুখ হয় তাহলে সকল বস্তু তার থেকে বিমুখ হবে।

چوازو گشتی ہمہ چیز ازتو گشت

"তুমি যখন আল্লাহ তা'আলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, তখন সব কিছুই তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।"

৮। তালিবে ইলমকে ব্যাপকভাবে আর তালিবে দ্বীনকে বিশেষভাবে সকল গোনাহ থেকে সাধারণভাবে আর জৈবিক চাহিদাগত: গোনাহ থেকে বিশেষভাবে দারুণ সতর্ক থাকতে হবে। কারণ গোনাহের দ্বারা সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষত: অন্তর ও মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে যায়। সৌন্দর্যও নষ্ট হয়ে যায়। চেহারা কুশ্রী ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

৯। ছাত্রদের উচিত শিক্ষকদের ব্যাপারে সুধারণা রাখা। যদি শিক্ষক কোনো ছাত্রের সাথে শাস্তিমূলক আচরণ করেন, তাহলে বুঝতে হবে সে ছাত্র এটারই উপযুক্ত। অথবা মনে করবে আল্লাহ না করুন যদি শিক্ষক কোনো অন্যায় করে থাকেন তাহলে সেটার হিসাব আল্লাহ তা'আলা নেবেন।

হযরত ইয়াকুব (আ.) হযরত ইউসুফ (আ.) এবং তাঁর ভাইদের ঘটনাকে সামনে রাখা উচিত। ছোট-বড় প্রত্যেকের এ ব্যবহার স্মরণ রাখা চাই।

১০। যদি উস্তাদ পড়ালেখার ব্যাপারে বকাঝকা দেন তাহলে সেটাকে খারাপ মনে করবে না। চেহারায় ভাঁজ ফেলবে না। বিরক্তি প্রকাশ করবে না। কারণ এর দ্বারা উস্তাদের মনে ব্যথা লাগবে। ফলশ্রুতিতে তাঁর থেকে উপকৃত হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা উস্তাদ থেকে উপকৃত হওয়া নির্ভর করে তাঁর অন্তরের প্রসন্নতা ও তাঁর সাথে ছাত্রের মনমানসিকতা এক হওয়ার ওপর। অথচ উল্লিখিত অবস্থায় উভয় ব্যাপারই অনুপস্থিত।

একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম তথা কারো থেকে উপকারিতা লাভের চাবিকাঠি হলো চাই তিনি খালেক হন বা মাখলূক; তাঁর সামনে নিজেকে মিটিয়ে দিতে হবে। নিজের মত ও সিদ্ধান্তের কোনো দখল সেখানে দেওয়া যাবে না। অতঃপর দেখুন কী উপকার হাসিল হয়! এটা অনেক বড় কৃতিত্বের ব্যাপার।

১১। তালিবে ইলমের অন্তর সব কিছু থেকে মুক্ত হাওয়া খুব জরুরি। চাই সেটা কোনো মানুষের সাথে হোক, অথবা খেলাধুলা, মোবাইল, হুক্কা, পান-তামাকের সাথেই হোক, কিংবা কারো সাথে অবৈধ সম্পর্কের সাথে হোক। নতুবা দ্বীনি ও দুনিয়াবী মুসীবতের কারণে ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। সকলের সামনে অপদস্থ হবে। এর কারণে মাদরাসা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পথও সুগম হতে পারে। কবির ভাষায়–

ہے وہ عاقل جو کہ آغاز میں سوچے انجام
ورنہ ناداں بھی سمجھ جاتا ہے کھوتے کھوتے

সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান, যে কাজের শুরুতেই পরিণামের কথা চিন্তা করে। নতুবা মুর্খও বুঝে ফেলে তবে ঠেকে ঠেকে।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

বসুন্ধরা মারকায, চট্টগ্রাম শুলকবহর মাদরাসাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) আকদে নিকাহের অনুষ্ঠান এবং হাদীসের দরসে বিবাহের শরয়ী নীতিমালা, সুন্নত তরীকা, সমাজে প্রচলিত রুসুম সম্পর্কে বিস্তারিত বয়ান ও তাকরীর পেশ করেন। তাঁর তাকরীর ও বয়ানগুলোর আলোকে প্রমাণিক এই প্রবন্ধটি সাজানো হয়েছে।

ইসলামী বিয়ে-৬

আমাদের দেশের মেয়েদের বৈশিষ্ট্যঃ

সব মেয়েদের মধ্যেই স্বভাবজাত নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। তবে অঞ্চলভিত্তিক এমন কিছু বৈশিষ্ট্যও তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, যা অন্য অঞ্চলের মেয়েদের মাঝে খুঁজে পাওয়া অনেকটা দুষ্কর। এই তফাতের মূলে রয়েছে ধর্ম, মাটি ও অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। তাই তো পৃথিবীর যেকোনো দেশ ও অঞ্চলের লোকদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, বৈবাহিক জীবন ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকগুলো পরখ করলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আমরা বাংলাদেশিরা মানবজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় সুখে-শান্তিতে ও অনেকটা নিরাপদে বসবাস করতেছি। এর মূলে দুটি জিনিস উল্লেখযোগ্য। (এক) ধর্মের প্রতি অনুরাগী হওয়া। (দুই) বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনে নারীদের অবদান। তাই আসুন জেনে নিই আমাদের দেশের নারীদের অবদান বৈশিষ্ট্যগুলো কি? যা তাদের বিশ্বের অন্য সব দেশের নারীদের থেকে আলাদা করে মানবতার উচ্চাসনে সমাসীন করেছে।

এক. স্বামীর অনুরাগী

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) ভারতবর্ষের নারীদের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে বলেন-

میں کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان کی عورتیں حوریں ہیں حسن وجمال میں نہیں بلکہ اخلاق میں ہندوستان کی عورتوں میں بہت فضائل ہیں۔

"আমি তো বলে থাকি যে, ভারতবর্ষের নারীরা জান্নাতের হুর তুল্য। রূপ-লাবণ্যে নয় বরং চারিত্রিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষের নারীদের অনেক গুণ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে।" (আত তাবলীগ পৃ. ৫১)

ভারতবর্ষ বলতে যদি পাক, ভারত, বাংলাদেশকে বোঝানো হয় তাহলে আমি বলব হযরত থানভী (রহ.)-এর উক্ত উক্তির প্রত্যায়নে প্রথম সারিতে বাংলাদেশের নারীরা থাকবে। আমাদের দেশের নারীরা তো বাস্তবেই জান্নাতের হুর তুল্য। যাদের (হুরদের) ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেন। عربا অর্থাৎ স্বামীদের পক্ষে প্রেমময়ী (সূরা ওয়াকি'আ-৩৭)। তদ্রূপ এ দেশের নারীরা ও স্বামীর পক্ষে প্রেমময়ী ও উৎসর্গ প্রাণ। স্বামী যতই কষ্ট দিক মাথা পেতে তা মেনে নেয়, সহ্য করে এবং ধৈর্যধারণ করে। কিন্তু চোখ খুলে পাশ্চাত্যের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, বৈবাহিক সম্পর্ক যেখানে সাগরের বুদ্বুদের ন্যায়, সামান্য ঢেউয়ে যার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। ভাঙা-গড়া স্বাভাবিক ব্যাপার, খেলনা তুল্য। আর এ দেশের নারীদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। অভিভাবকদের মাধ্যমে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা তারা ভাঙতে জানে না। এ ক্ষেত্রে হযরত থানভীর (রহ.) কথাই যথার্থ তিনি বলেন-

میں تجربے سے بقسم کہتا ہوں کہ یہاں کی عورتوں کی رگ رگ میں خاوند کی محبت گھسی ہوئی ہے۔

অর্থাৎ অভিজ্ঞতার আলোকে শপথ করে বলতে পারি যে, অত্র অঞ্চলের নারীদের রগ-রেসায় রয়েছে স্বামীর প্রেম-ভালোবাসা।

দুই. শুশ্রূষাকারী :

কোনো কারণে স্বামীর সাথে হাজারো ঝগড়াঝাটি হওয়ার মাঝেও যদি স্বামী অসুস্থ বা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন নিজেকে স্বামীর সেবক হিসেবে উৎসর্গ করে দেয়। রাতের ঘুমকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়। স্বামীর সেবায় নিজেকে এমনভাবে সঁপে দেয় কেউ দেখলে বুঝতেই পারবে না যে, কিছুক্ষণ পূর্বে তারাই ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত ছিল।

তিন. স্বার্থত্যাগী :

এ দেশের নারীরা পরিবারের পুরুষদের জন্য নিজেদের অনেক স্বার্থ ত্যাগ করে থাকে। যেমন

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটি দেখুন, প্রতি বেলায় তারা প্রথমে পুরুষদেরকে খেতে দেয় এরপর নিজেরা খেয়ে থাকে। ফলে নাস্তা করতে দেখা যায় দিনের ১১ থেকে ১২টায়। দুপুরের খানা খেতে দেখা যায় আসরের নামাজের আগে বা পরে। আর রাতের খানা শোবার আগে রাত ১১টা থেকে ১২টার মাঝে। অন্যদিকে মানগত দিক দিয়ে পাতিলের ভালো ও উৎকৃষ্ট খাবারগুলোই পুরুষদের জন্য নিজেদের হাতে বিলিয়ে দেয়। আর নিজেরা পাতিলের তলানি এবং পুরুষদের পরিত্যক্ত ও উচ্ছিষ্টের ওপরই তুষ্ট থাকে।

চার. চিন্তা-চেতনায় স্বামী ও পরিবারের মান-সম্মান :

এ দেশের মেয়েদের চিন্তা-চেতনায় স্বামী ও পরিবারের মান-সম্মানের দিকটি সব সময় পরিলক্ষিত হয়। যেমন ঘরে অসময়ে মেহমান চলে এল। তখন তারা স্বামী ও পরিবারের সম্মানকে নীচু হতে দেয় না। নিজেরা না খেয়ে ঘরে যা থাকে তার সবটুকুই মেহমানের জন্য পরিবেশন করে। ভাই! এটা তো অতি উঁচুমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা অধিকাংশ পুরুষের মধ্যে নেই বললেই চলে।

পাঁচ. ধৈর্যশীল ও সহনশীল :

এ দেশের দীক্ষিত ও ভদ্র মেয়েরা স্বামীদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে জানে না। কথার ছলে বান্ধবী-সখীদের সাথে হাজারো কথা মনের অজান্তে বলে ফেললেও সখীরা তাকে ধৈর্যধারণ এবং স্বামী ভক্তির নসীহতই শোনায়। কিন্তু কেউ যদি তার স্বামীকে বিচারের সম্মুখীন করার কুবুদ্ধি বা প্ররোচনা দেয় তাহলে ভয়ে তার মধ্যে এক ধরনের কম্পন সৃষ্টি হয় এবং জোড়ালোভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে। এমন ঘটনা বহু পাওয়া যাবে যে, যৌক্তিক কারণে অভিভাবকরা ছেলের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি টানতে চায়। কিন্তু মেয়ে তা নিঃশব্দে প্রত্যাখ্যান করে উল্টো পিতা-মাতাকে ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্যাপারটি যা-ই হোক না কেন, এমনটা কিন্তু অতি মাত্রায় স্বামী ভক্তির কারণেই হয়ে থাকে।

আমি এ কথা বলিনা যে, এ দেশের কোনো মেয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে যায় না। যেতে পারে! তবে হাজারে চার-পাঁচটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যাপকভাবে তাদের ধৈর্যশীল ও সহনশীল হওয়ার গুণে কলঙ্ক লেপন করতে পারবে না।

এখানে আরেকটি কথা যোগ করতে চাই যে, আমাদের দেশের যৌথ পরিবার নীতিতে পুত্রবধূরা শরীয়ত কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার বঞ্চিত। এ ক্ষেত্রে শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-দেবর ও ভাশুরদের অবদান অনেক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে। আশা করি কোনো বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি তা অস্বীকার করতে পারবে না। ভুক্তভোগীরা তো একমত হবেনই। হ্যাঁ, হাজারে বা লাখে এর ব্যতিক্রম দু-একটি ফ্যামিলি পাওয়া গেলে তা হবে গোবরে পদ্ম ফুলের মতো। মোদ্দা কথা হলো, চলমান যৌথ ফ্যামিলিনীতি সামাজিকভাবে গৃহীত হলে ও শরীয়ত পরিপন্থী অনেক দিকও এতে বিদ্যমান রয়েছে, এই নীতিতে উপকার ও ভালো দিকগুলোর চেয়ে মন্দ ও ক্ষতিকর দিকের সংখ্যা হাজার গুণ বেশি হবে। এই দ্বৈত নীতির যৌথ নির্যাতনকে ও এ দেশের নারীরা নীরবে, নিঃশব্দে সয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র ধর্ম, স্বামী ও সন্তানদের দিকে তাকিয়ে।

ছয়. অধিকার ত্যাগী :

অনেক দেশের নারীদের দেখা যায়, স্বামীর থেকে নিজের চাহিদামতো খোরপোষ পাওয়ার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে। ব্যার্থ হলে বিচ্ছেদ অনিবার্য। আর এ দেশের নারীরা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম, কষ্ট করবে খেটে খাবে তারপরও আদালতের নাম নেবে না, যেহেতু এটি চরম ঘৃণিত। বহু দেশ এমন আছে, যেখানে মহর অগ্রিম দিয়ে দিতে হয়, আর এ দেশের মেয়েরা তো মহরের কথা মুখেও উচ্চারণ করে না, চাওয়া তো দূরের কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর সময় স্বেচ্ছায় মাফ করে দেয়।

সাত. পরিশ্রমী :

পারিবারিক কাজ-কর্ম, বাচ্চাদের লালন-পালন নিজ হাতে করে থাকে, সেবিকার ওপর নির্ভরশীল নয়। পরিবারের জন্য ঘাম ঝরানো শ্রম দেয়া তাদের নিত্যদিনের রুটিন। আরে ভাই! কত স্বামী ও পরিবার তো স্ত্রী ও মেয়েদের কষ্টার্জিত অর্থের মুখাপেক্ষী।

আট. সরলমনা :

এ দেশের মেয়েরা অবুঝ ও পার্থিব জ্ঞানশূন্য হতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে এ গুণটি পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে যে, তারা ধোঁকাবাজ ও প্রতারক হয় না। কুরআনে মেয়েদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হচ্ছে-الغفلات المؤمنات এর দ্বারা বুঝে আসে বহির্জগৎ সম্পর্কে বে-খবর থাকাই নারীদের প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। হযরত থানভী (রহ.) বলেন,

اب نالائق کہتے ہیں کہ پردہ توڑ کر بے پردہ ہوجاؤ اور ترقی کرو عجیب گوبر دماغوں میں بھرا ہے۔

অর্থাৎ এখন তো অনেকে বলে যে,

পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে এসো এবং উন্নতি করো, এটি গোবরভর্তি মস্তিষ্কপ্রসূত মন্তব্য। (আল ইফাদাত১/১৪১)

আরেকটি কথা স্মরণ রাখা জরুরি যে, একজন মেয়ের অনেক কিছু আছে, কিন্তু লজ্জা নামক জিনিসটি নেই তাহলে সে অনেক কিছু হতে পারে কিন্তু প্রকৃত মেয়ে নয়। সুতরাং যে মেয়ে নিলর্জ্জ হবে তার সব কিছুই ব্যর্থ। থানভী (রহ.) সুন্দর বলেছেন-

جب حق تعالی عورتوں کے بھولے پن اور بےخبری کی تعریف فرماتے ہیں تو سمجھ لو اسی میں خیر ہے اور اس خبرداری میں خیر نہیں جس کو تم تجویز کرتے ہو تجربہ خود بتلا دیگا۔

অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের সরলতা ও অনভিজ্ঞতার প্রশংসা করেছেন সুতরাং বুঝে নাও এর মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর ওই অভিজ্ঞতার মধ্যে কল্যাণ নেই যা তোমরা অবলম্বন করেছ। অভিজ্ঞতাই বলে দেবে। (হুকুকুল বাইত ৪৪, ইসলামী শাদী পৃ. ৪৩)

বোঝা গেল কুরআনের শিক্ষা হলো, মহিলাদের জন্য সারল্য ও বহির্জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞতাই শ্রেয়। আলহামদুলিল্লাহ! এ দেশের নারীদের মধ্যে এ গুণটি অতুলনীয়।

নয়. চারিত্রিক নিষ্কলুষতা :

এ দেশের সাধারণ নারীদের দৃষ্টি স্বামীর ওপরই নিবদ্ধ থাকে। পরপুরুষের প্রতি তাদের কোনা আকর্ষণ নেই। স্বামী যতই কুৎসিত হোক না কেন, অন্যের প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না। সাধারণত তাদের অবস্থান ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রয়োজনে বের হলে পরিপূর্ণ পর্দার বিধান মেনে চোখকে সংযত রেখেই বের হয়। রাস্তায় পরপুরুষকে সালাম করতে দেখা যায় না। অচেনা ও বয়সে বড় নারীদের বেলায় ও তারা লাজুক। তার প্রতি কোনো পরপুরুষের আকর্ষণ রয়েছে জানতে পারলে তার প্রতি চরম ঘৃণা জন্ম নেয়। এটাই এ দেশ এবং এ দেশের সাধারণ সরলমনা নারীদের দীক্ষা ও সভ্যতা। অন্য দিকে আধুনিক সভ্যতার আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের দিকে তাকান চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো পাবেন। হযরত থানভী (রহ.) খুব সুন্দর বলেছেন-

اور ہندوستان کی عورتوں کو جو مردوں کے ساتھ اس قدر تعلق ہے، یہ زمین ہند کا خاصہ ہے اور ستی کی رسم کا منشاء بھی یہی تعلق ہے، گو یہ غلو ہے۔

অর্থাৎ ভারতবর্ষের নারীদের স্বামীদের প্রতি আগাধ ভালোবাসার মূলে এ অঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য ও অবদান সর্বাধিক। আর হিন্দু ধর্মে সতীদাহ প্রথার মূলেও এ সম্পর্কই। তবে প্রথাটি নিঃসন্দেহে মানবতাবিরোধী ও গোঁড়ামি। (হুকুকুয যাওজাইন পৃ. ১৫১)

দশ. স্বামীর তরফদার :

এ দেশের নারীদের স্বামীদের তরফদারির কোনো জুড়ি নেই। যেমন, বিবাহ-পরবর্তীতে স্বামীর সাথে নিজের পিতা-মাতা বা আত্মীয়স্বজনের মধ্য হতে কারো তিক্ততা সৃষ্টি হলে অন্ধভাবে স্বামীর তরফদারি-পক্ষপাতিত্ব করবে, প্রয়োজনে পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন সবাইকে বিসর্জন দেবে তবুও স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করবে না।

বিদেশি রমনী নয় দেশিনী কাম্য :

যে দেশের নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান এবং যে দেশের নারীরা ধার্মিকতা ও মানবিক গুণাবলিতে অতুলনীয় সে দেশের প্রকৃত দেশ প্রেমিক কোনো পুরুষের জন্য মনোলোভা বাহ্যিক চাকচিক্যে বিভোর হয়ে কোনো বিদেশি ললনাকে নিয়ে নিজের ঘর সাজানোর মনমানিসকতা কোনো অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না, এ ছাড়া এটা দেশ জাতি ও সমাজের জন্য ও সুখকর নয়। স্বজাতি নারীদের অবজ্ঞা করার প্রবণতা তো রয়েছেই। সুতরাং বিদেশিনী নয়, একজন দেশিনীকে দুলহান বানিয়ে ঘরে তোলাই হবে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাজ। একই কথা সে সব নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যারা ভিনদেশি ভিন্নধর্মী বরকে বরণ করতে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে।

সাবধান!!

এ দেশের নারীদের ধার্মিকতা, সামাজিকতা, সরলতা, সাংসারিক মনমানিসকতা, উদারতা, লাজুকতা, সহিষ্ণুতা এবং মানবীয় অন্যান্য গুণাবলি ছিল এখনো আছে ঈর্ষণীয় পর্যায়ে। কিন্তু সামনে মহা বিপদ সংকেত। কারণ অন্যের ভালো ভালো লাগে না, অন্যের সুখে গায়ে জ্বালা হয়– এমন এক শ্রেণীর লোকেরা ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমদানি করে এ দেশের যুবসমাজ ও অবলা নারীসমাজকে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। সুতরাং কালক্ষেপণ না করে এখনই সাবধান হওয়ার মুখ্য সময়। অবহেলা মহা বিপর্যয় ডেকে আনবে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

তাহকীক ও গ্রন্থনায় :

মুফতী নূর মুহাম্মদ

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরল পথ

মাযহাব না মানলে হাদীসের উপরও পুরোপুরি আমল করা সম্ভব নয়

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

আহলে হাদীস ভাইয়েরা আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মাযহাব অর্থাৎ হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাদের মতামত ও সিদ্ধান্তের কোনো তোয়াক্কা করেন না। তারা নিজেদের বোধ-বুদ্ধিমাফিক সরাসরি হাদীসের ওপর আমল করার দাবি করে থাকেন। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, একজন অ-মুজতাহিদের পক্ষে মাযহাব না মেনে কিছুতেই হাদীসের ওপর পূর্ণভাবে আমল করা সম্ভব নয়। কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যাক-

১. জামা'আতে নামায আদায়কালীন মুসল্লীদের পরস্পরের পা কিভাবে থাকবে, এ ব্যাপারে হাদীসের কিতাবসমূহে কয়েক ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়।

(ক)

عن انسؓ وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه۔

অর্থ: হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নামাযে আমাদের প্রত্যেকে তার কাঁধ পাশের ব্যক্তির কাঁধের সাথে মিলিয়ে রাখত এবং পা পাশের ব্যক্তির পায়ের সাথে মিলিয়ে রাখত। (বুখারী শরীফ হা. নং-৭২৫)

এ হাদীস দ্বারা বাহ্যত মনে হচ্ছে, উভয় মুসল্লীর পা মিলানো থাকবে।

(খ)

قال رسول الله ﷺ:اذا صلى احدكم فلا يضع نعله عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره الا ان لا يكون عن يساره احد ويضعهما بين رجليه۔

অর্থ: তোমরা নামাযে তোমাদের ডান পায়ের পাশে জুতা রাখবে না (কারণ সেখানে ফেরেশতা থাকে) এবং তোমাদের বাঁ পায়ের পাশেও রাখবে না। কারণ সেটা অন্য ভাইয়ের ডান পাশ। (আবু দাউদ হা.নং-৬৫৪)

এই হাদীস দ্বারা বাহ্যত বোঝা যাচ্ছে, দুই মুসল্লীর পায়ের মাঝখানে ফাঁকা থাকবে, যেখানে জুতা রাখা সম্ভব। কিন্তু নবীজি (সা.) সেখানে জুতা রাখতে নিষেধ করেছেন। দু'জনের পায়ের মাঝখানে যদি ফাঁকাই না থাকে তাহলে তো জুতা রাখতে নিষেধ করার কোনো মানে হয় না।

উক্ত দুই হাদীসের বাহ্যবিরোধ লক্ষ্য করে আহলে হাদীস ভাইয়েরা দ্বিতীয় হাদীসের ওপর আমল করা ত্যাগ করেছেন এবং হাদীসটিকে এক প্রকার অস্বীকার করেছেন। কিন্তু যারা মাযহাব মানেন বিশেষত হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ নিজেদের ইমামের মাযহাব অর্থাৎ ব্যাখ্যা অনুযায়ী (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৭৩)উভয় মুসল্লীর পায়ের মাঝে সামান্য ফাঁকা রাখেন। এতে উভয় হাদীসের ওপর তাদের আমল হয়ে যায়। দ্বিতীয় হাদীসের ওপর আমল হয় সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে আর প্রথম হাদীসের ওপর আমল হয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষে পরোক্ষভাবে। এভাবে যে, মুহাক্কিক আলেমগণ বলেছেন, প্রথম হাদীসের يلزق শব্দ থেকে উভয় মুসল্লীর পা মিলিয়ে রাখার যে অর্থ বাহ্যতঃ বুঝে আসে হাদীসে তা বুঝানো হয়নি। কেননা الزاق শব্দের বাহ্যিক অর্থ মিলানো হলেও এখানে তা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ, সে ক্ষেত্রে তখন স্বয়ং প্রথম হাদীসের ওপরই আমল করা সম্ভব হবে না। দেখুন না, হাদীসে মুসল্লীদের পরস্পরে কাঁধ ও পা মিলিয়ে রাখার কথা বলা হয়েছে। অথচ মুসল্লীদের পরস্পরে পায়ে পা মিলিয়ে রেখে একই সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। বিশ্বাস না হলে পাশাপাশি পাঁচজন লোক নিজ নিজ পায়ের মাঝে এক বিঘতের বেশি ফাঁকা রেখে (যেমনটি আহলে হাদীসের ভাইয়েরা করে থাকেন) তারপর পাশের জনের পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিন এবং এ অবস্থায় সকলেই পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাখার চেষ্টা করুন; কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না বিশেষতঃ মুসল্লীগণ যদি দৈর্ঘ্যে কমবেশি হয়ে থাকেন। যদি বলা হয়, পা মিলিয়ে রাখলেই হবে; কাঁধ মিলানো জরুরি নয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা একই হাদীসে বর্ণিত একই ধরনের দুটি বিধানের একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে আঁকড়ে ধরা কিংবা একটিকে প্রাধান্য দেয়ার মানে নেই। তা ছাড়া আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত (হা. নং-৬৬২) নূ'মান ইবনে বশীর (রা.) থেকে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه

অর্থ: আমি দেখেছি, লোকে নামাযে তার কাঁধ পার্শ্ববর্তীর কাঁধের সাথে, তার হাঁটু পার্শ্ববর্তীর হাঁটুর সাথে আর

টাখনু টাখনুর সাথে মিলিয়ে রাখত।
পাঠক! হাঁটুর সাথে হাঁটু রাখতে হলে তো দু'জন ব্যক্তিকে মুখোমুখি বসে তবেই কাজটি করতে হবে। দাঁড়ানো অবস্থায় এটা বিলকুল অসম্ভব। যাহোক, রেওয়ায়েতগুলোর মধ্যে এই যে এতগুলো অসংগতি সৃষ্টি হচ্ছে, তা মূলতঃ يلزق শব্দটিকে মিলানো অর্থে ব্যবহার করার কারণে। সুতরাং বাধ্য হয়েই শব্দটিকে কাছাকাছি, পাশাপাশি, সমান ও সমান্তরাল অর্থে ব্যবহার করতে হবে। যেমন আরবী ভাষায় مررت بزيد বাক্যটির ب বর্ণের মূল অর্থ মিলানো হলেও অর্থ করা হয়, আমি যায়েদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করেছি। এখানে কেউ এ অর্থ করে না যে, আমি যায়েদের শরীরের সাথে শরীর মিলিয়ে তাকে অতিক্রম করেছি। সুতরাং হাদীসে يلزق শব্দটিকে মিলানো অর্থে আতিশয্যের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যেন কেউ কাতারের মাঝখানে অযথাই ফাঁকা না রাখে। কিংবা কাতার সোজা করার সময় পা, কাঁধ মিলিয়ে মিলিয়ে কাতার সোজা করার কথা বলা হয়েছে। কাতার সোজা হওয়ার পরও নামাযের মধ্যেও তা ধরে রাখতে হবে। সেটা বলা হয়নি। নচেৎ সিজদা থেকে পরবর্তী রাকা'আতের জন্য উঠে মুসল্লীকে আবার তার পার্শ্ববর্তীর পা খুঁজে বের করে তার সাথে নিজের পা মিলাতে হবে। যা নিঃসন্দেহে নামাযের একাগ্রতা বিনষ্টকারী হওয়ায় মাকরুহ বলে গণ্য হবে। মোদ্দাকথা, এতসব বিষয় বিবেচনা করে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) দ্বিতীয় হাদীসের ওপর সরাসরি আমল করার কথা বলেছেন। আর প্রথম হাদীসের يلزق শব্দটির ব্যাখ্যা সাপেক্ষে সেটার ওপরও আমল করেছেন। এটাই হানাফীদের মাযহাব। এর দ্বারা এ-সংক্রান্ত সকল হাদীসের ওপর আমল হয়ে যাচ্ছে, চাই তা সহীহ, যঈফ যা-ই হোক না কেন। সাথে সাথে মুসল্লীগণ নামাযে একাগ্রতাও ধরে রাখতে পারছেন যেটা নামাযের অন্যতম কাম্য বিষয়।
এখন বলুন, বুখারী, মুসলিমে নেই কিংবা আমাদের তাহকীক(?)অনুযায়ী সহীহ নয় এই ধোঁয়া তুলে এক হাদীসের অর্ধেকের ওপর আমল করা উচিত না এমনভাবে আমল করা উচিত, যাতে সকল হাদীসের বাহ্যবিরোধ শেষ হয়ে সবগুলোর ওপর একই সঙ্গে আমল হয়ে যায়? তবে হাদীসের এসব সূক্ষ্মও খুঁটিনাটি বিষয় অনুধাবনের জন্য সতেজ ও সজীব মস্তিষ্কের প্রয়োজন; ভারবাহী প্রাণী বিশেষের মেজাজ নিয়ে তা সম্ভব নয়।

২. তাকবীরে তাহরীমার সময় নামাযী তার হাত কতটুকু উপরে উঠাবে এ বিষয়ক কয়েকটি রেওয়ায়েত দেখুন :

(ক)

عن ابن عمرؓ ان رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة۔

অর্থ: হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নামায শুরু করতেন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। (বুখারী শরীফ হা. নং-৭৩৫, মুসলিম হা.২২, ৩৯০)
জানা গেল, তাকবীরে তাহরীমার সময় মুসল্লী হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে।

(খ)

عن مالك بن حويرث قال: كان رسول الله ﷺ اذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بهما اذنيه۔ وفى رواية حتى يحاذى بهما فروع اذنيه

অর্থ: হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, উভয় হাত কান বরাবর উঠাতেন। অন্য বর্ণনায় আছে, উভয় হাত কানের উপরের অংশ বরাবর উঠাতেন। (বুখারী হা.৭৩৭, মুসলিম হা. ২৫, ৩৯১)
এই হাদীস দ্বারা জানা যাচ্ছে, মুসল্লীগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত কান বরাবর উঠাবে।
দু'টি হাদীসই বুখারী, মুসলিমে এসেছে এবং বাহ্যত পরস্পরবিরোধী। সাহাবায়ে কেরামসহ যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদগণ দুই হাদীসের সমন্বয়ে বলেছেন, কাঁধ বরাবর হাত উঠানোর হাদীসটি মহিলা নামাযীর জন্য। এটা তাদের পর্দার বিধানের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর কান বরাবর হাত উঠানোর হাদীসটি পুরুষ নামাযীর জন্য। তাদের গঠন-প্রকৃতি হিসেবে এটাই মানানসই। লক্ষ্য করুন, যদি এখানে পুরুষদের জন্য দ্বিতীয় হাদীসটি মা'মুলবিহী বা আমলযোগ্য সাব্যস্ত করা হলো, কিন্তু তাদের এই আমলের মাধ্যমে প্রথম হাদীসের ওপরও আমল হয়ে যাচ্ছে। কেননা কান পর্যন্ত হাত উঠাতে তো কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেই হয়। আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীস যদিও তা বুখারী মুসলিমের রেওয়ায়েতের সমতুল্য নয়। কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যাকে দারুণভাবে সমর্থন করছে-

عن وائل ابن حجر انه ابصر النبى ﷺ حين قام الى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى ابهاميه اذنيه ثم كبر۔

অর্থ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবীজি (সা.) কে দেখেছেন, যখন তিনি নামাযে দাঁড়াতেন, দুই হাত

এমনভাবে উঠাতেন যে তা কাঁধ বরাবর হয়ে যেত, আর তার বৃদ্ধাঙ্গুল দু'টি কান বরাবর হয়ে যেত। তারপর তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। (আবু দাউদ হা.৭২৪)

এখন কেউ যদি আহলুল হাদীস বন্ধুদের কথামতো কাঁধ বরাবর হাত তোলেন তাহলে স্বয়ং বুখারী, মুসলিমেরই এক হাদীসের ওপর আমল করা হবে আর অপর হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হবে। তাহলে বলুন, হাদীস মানতে হলে মাযহাব মানার কোনো বিকল্প আছে কি?

৩. তাকবীরে তাহরীমা বলার পর হাত কোথায় বাঁধবে :

দু'টি হাদীস লক্ষ্য করুন-

(ক).

عن طاؤس قال: كان رسول الله ﷺ يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يشدبهما على صدره وهو فى الصلاة۔

অর্থ: হযরত তাউস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাযে ডান হাতকে বাঁ হাতের ওপর রেখে বুকের ওপর শক্ত করে বাঁধতেন। (আবু দাউদ-৭৫৯)

এই হাদীসকে সঠিক ধরা হলে বাহ্যত মনে হয়, তাকবীরে তাহরীমা বলার পর মুসল্লীর হাত বুকের ওপর থাকবে।

(খ)

عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه قال رأيت النبى ﷺ وضع يمينه على شماله فى الصلوة تحت السرة

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর বর্ণনা করেছেন, আমি নবীজিকে নামাযে ডান হাতকে বাঁ হাতের ওপর নাভীর নিচে বাঁধতে দেখেছি। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/৩৪২)

(গ)

عن حجاج بن حسان قال سمعت ابامجلز او قال سألته قال كيف يصنع؟ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله يجعلها اسفل من السرة۔

অর্থ: হযরত হাজ্জাজ ইবনে হাসসান থেকে বর্ণিত, তিনি আবু মিজলায থেকে শুনেছেন, অথবা তাকে প্রশ্ন করেছেন, নামাযে হাত কিভাবে বাঁধতে হবে? তিনি বললেন, ডান হাতের তালু বাঁ হাতের পিঠের ওপর নাভীর নিচে রাখবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.৩৯৪২)

(ঘ)

عن علىؓ قال ان من السنة فى الصلوة وضع الا كف على الا كف تحت السرة۔

অর্থ: হযরত আলী (রা.) বলেছেন, নামাযে নবীজির সুন্নাত হলো ডান হাতকে বাঁ হাতের ওপর নাভীর নিচে রাখা। (আবু দাউদ হা.৭৫৬)

এই সকল হাদীসে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, তাকবীরে তাহরীমার পর নামাযী হাত নাভীর নিচে বাঁধবে।

বাহ্যতঃ ১ম হাদীস এবং পরবর্তী হাদীস তিনটা পরস্পরবিরোধী মনে হচ্ছে। কিন্তু একজন ফকীহ ও মুজতাহিদের সূক্ষ্মদর্শিতা সহজেই এর রহস্য ভেদ করতে সক্ষম। তারা এই দুই প্রকার হাদীসের সমন্বয় সাধনে বলেছেন, বুকের ওপর হাত বাঁধার হাদীসটি মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ এটা পর্দার অধিকতর নিকটবর্তী। আর দ্বিতীয় হাদীসটি পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য। তাদের গঠন আকৃতির ভিত্তিতে এটাই মুনাসিব। তো এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে উভয় হাদীসের ওপরই আমল হয়ে গেল। অথবা ১ম হাদীসের ব্যাখ্যা হল, শুধুমাত্র বৈধতা বুঝানোর জন্য নবীজি (সা.) কখনো কখনো বুকের ওপর হাত বাঁধতেন, তবে তার আসল আমল ছিল নাভীর নিচে হাত বাঁধা, যেটা ২য় হাদীসে এবং হযরত আলী (রা.) ও আবু মিযলাযের হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে কিন্তু আহলুল হাদীস বন্ধুদের কথামতো যদি শুধু বুকের ওপর হাত রাখার হাদীসকে গ্রহণ করা হয় তাহলে নাভীর নিচে হাত বাঁধার হাদীসগুলো আমলবিহীন থেকে যাবে। বরং এ আমলটিকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করা হবে। পক্ষান্তরে ফুকাহায়ে কেরামের মতটি গ্রহণ করলে নবীজি (সা.)-এর উভয় প্রকার আমলই যথাযোগ্য মর্যাদায় সংরক্ষিত রইল। এ হিসেবে প্রকৃত আহলুস সুন্নাহ হলো, ফুকাহায়ে কেরাম ও তাদের মাযহাব অনুসারীগণ।

৪। নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান :

নিম্নের বর্ণনাগুলো লক্ষ্য করুন।

ক.

عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله ﷺ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔

অর্থ: হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বে না তার নামায হবে না। (বুখারী হা.৭৫৬, মুসলিম-৩৪, ৩৯৪)

খ.

عن ابى هريرةؓ وقتادة واذا قرأ فانصتوا

অর্থ: যখন ইমাম সূরা-কিরাআত পড়ে তখন তোমরা চুপ থাক। (মুসলিম হা.৬৩, ৪০৪)

গ.

ان رسول الله ﷺ قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة۔

অর্থ: নবীজি (সা.) ইরশাদ করেন, যে মুসল্লীর ইমাম রয়েছে তার ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক ৬২,৬৩)

প্রথম হাদীস থেকে জানা গেল, নামায সহীহ হওয়ার জন্য সূরা ফাতিহা পড়া জরুরি। দ্বিতীয় হাদীস থেকে জানা গেল, ইমামের সূরা-কিরাআত পড়াকালীন মুক্তাদিদের জন্য চুপ থাকাই হলো ইমামের অনুসরণ করা। তাহলে প্রথম হাদীসে বর্ণিত সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপক বিধান থেকে দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা মুক্তাদীর বিধান পৃথক হয়ে গেল। অর্থাৎ ইমামের পেছনে মুক্তাদিকে আর কিরাআত পড়তে হবে না। চাই তা সূরা ফাতিহা হোক বা অন্য কোনো সূরাই হোক। এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে তৃতীয় হাদীসটি। যেখানে বলা হয়েছে, যার ইমাম আছে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত বলে গণ্য হবে। আর যেহেতু সূরা ফাতিহাও কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত তাই তাকে আর আলাদা করে সূরা ফাতিহাও পড়তে হবে না। বরং ইমামের ফাতিহাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। হাদীস অনুসরণের দাবিদার বন্ধুরা শুধুমাত্র প্রথম হাদীসটি গ্রহণ করে ইমাম মুক্তাদি সকলের জন্য সূরা ফাতিহা পড়া বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছেন, আর অপর দুই হাদীসকে বিলকুল ছেড়ে দিয়েছেন। এটা হাদীসের প্রতি অবজ্ঞা দায়িত্বহীনতা ও উদাসীনতার প্রমাণ বহন করে। পক্ষান্তরে মাযহাবের ইমামগণ নবীজি (সা.)-এর প্রতিটি আমল সংরক্ষণের চেষ্টা করেছেন। তারা চেয়েছেন, একান্ত জাল ও বানোয়াট না হলে বাহ্যবিরোধপূর্ণ হাদীসগুলো দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হলেও সেগুলোর মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করা, যাতে কোনো না কোনো পর্যায়ে সকল হাদীসই উম্মতের মধ্যে কার্যতঃ যিন্দা থাকে। আল্লাহ প্রদত্ত মাকবুলিয়াতের ফলে তারা সে চেষ্টায় সফলও হয়েছেন। আর উম্মতে মুসলিমাও তাদের কথা বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করেছেন।

৫. সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলার পদ্ধতি :

হাদীস দুটি লক্ষ্য করুন

(ক)

عن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله ﷺ قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مدبها صوته۔

অর্থ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়তে শুনেছি। তারপর তিনি আমীন বলেছেন। আর শব্দটিকে তিনি টেনে দীর্ঘ করে বলেছেন। (তিরমিযী হা.২৪৮, আবু দাউদ হা.৯৩২)

এই হাদীস থেকে কেউ কেউ উচ্চস্বরে আমীন বলার বিধান বের করেছেন যদিও মাদ্দা শব্দের অর্থ উচ্চ আওয়াজ নয় বরং এর অর্থ হলো, দীর্ঘস্বরে টেনে পড়া।

(খ)

عن علقمة بن وائل عن ابيه انه صلى مع النبى ﷺ حين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يخفض بها صوته۔

সেই পূর্বোক্ত সাহাবী হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবীজি (সা.)-এর সঙ্গে নামায আদায় করলেন। নবীজি (সা.) যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়লেন তখন অনুচ্চস্বরে আমীন বললেন। (মুসতাদরাকে হাকেম হা. ২৯১৩)

পূর্বোক্ত দু'টি হাদীসই হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত। প্রথম হাদীসে তিনি দীর্ঘস্বরে আমীন বলার কথা উল্লেখ করেছেন, আর দ্বিতীয় হাদীসে তা অনুচ্চস্বরে বলার বর্ণনা দিয়েছেন। এই উভয় বর্ণনা মিলে অর্থ দাঁড়াল, নবীজি (সা.) আমীন শব্দটিকে দীর্ঘস্বরে অনুচ্চ আওয়াজে পড়তেন। আর এই উভয় কথার মধ্যে কোনো সংঘর্ষ নেই। কারণ একটি শব্দকে অনুচ্চ আওয়াজে টেনে টেনে পড়া বিলকুল সম্ভব। এটাই হানাফীদের আমল। তারা আমীনকে অনুচ্চস্বরে টেনে টেনে পড়েন। আর যদি মাদ্দা এর অর্থ উচ্চস্বর বলা হয় যেমনটি আহলুল হাদীস ভাইয়েরা বুঝেছেন, তাহলে উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হবে যে, নবীজি (সা.) উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সূরা ফাতিহার শেষে কখনো কখনো হালকা আওয়াজে আমীন পড়েছেন। এটাই ফুকাহাদের ব্যাখ্যা যা যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু আহলে হাদীস ভাইদের মতানুযায়ী যদি সজোরে আমীন বলার হাদীসকে গ্রহণ করা হয় তাহলে আস্তে আমীন বলার হাদীস যেটা নবীজি (সা.)-এর স্থায়ী আমল ছিল তাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। ফলে হাদীসের আংশিক মেনে বাকিগুলোকে অস্বীকার করা হয়। এটা তো হাদীস মানা নয়; হাদীস মানার নামে হাদীস নিয়ে তামাশার নামান্তর এবং অসংখ্য হাদীস অস্বীকার করে দ্বীনও ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জঘন্য পথ অবলম্বন। এ ধ্বংসাত্মক পথ থেকে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক : শায়খুল হাদীস ও মুফতী জামিয়া রহমানিয়া, মোহাম্মদপুর ঢাকা।

মহিলারা মসজিদ-ঈদগাহে যাবে কি না?

মুফতী রফিকুল ইসলাম আলমাদানী

সৃষ্টিগতভাবে নারী-পুরুষের আকৃতি-প্রকৃতি-স্বভাব ও আচার-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন তাদের কাজকর্ম ও দায়দায়িত্ব। পুরুষ যা পারে মহিলা তা পারে না। আবার মহিলারা অনেক কিছুতে অভ্যস্ত, যা পুরুষদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। এসব ব্যবধানের কারণেই তার পোশাক পরিচ্ছেদ ভিন্ন, কর্মস্থল ভিন্ন, দায়দায়িত্ব ভিন্ন। ভিন্ন তাদের মধ্যে শরীয়তের অনেক বিধি-বিধান।

সন্তানধারণ, সন্তানের পরিচর্যা, দুধ পান করানো ইত্যাদি মহিলাদের পক্ষেই সম্ভব। অন্যদিকে সাংসারিক দায়দায়িত্ব বহন করা, খানাপিনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা পুরষের জন্যই শোভা পায়। শরীয়তের আলোকে মহর পাওয়া মহিলার অধিকার আর তা যথাযথভাবে আদায় করা পুরুষের দায়িত্ব-ফরয। এছাড়া ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলোর দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাব–

হজ্বের ইহরাম অবস্থায় পুরুষদের জন্য মাথা আবৃত করা নিষেধ আর মহিলাদের ক্ষেত্রে মাথা ঢাকা ফরয। হজ্ব পালনের সময় পুরুষগণ উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়বে আর মহিলাগণ তা আদায় করবে নিম্নস্বরে। পুরুষদের তাওয়াফে রমল করতে হয় অথচ মহিলাদের জন্য তা নিষেধ। নামাযে ইমাম সাহেবের ভুল হলে পুরুষগণ স্বশব্দে লুক্বমা দেবে, আর মহিলাগণ এমন না করে হাতের ওপর হাত রেখে ইঙ্গিত করবে। একই ধারায় পুরুষ মহিলার নামাযের পদ্ধতিগত ব্যবধান ও তাদের নামায আদায়ের স্থানের ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য। পুরুষদের ওপর জুম'আর নামায ফরয, ঈদের নামায ওয়াজিব, ফরয নামায জামা'আতে আদায় করা ওয়াজিব। জামাআতে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ফজীলত বর্ণনা করে, জামা'আতে নামায আদায় করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে জুম'আ ও ঈদের নামায মহিলাদের ওপর ফরয-ওয়াজিব কিছুই নয়। ফরয নামায জামা'আতে আদায় করার কোনো নির্দেশ তাদের প্রতি নেই। বরং অসংখ্য সহীহ হাদীসে তাদেরকে আপন কক্ষে নির্জনে নামায আদায় করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে কয়েকটি হাদীসের সারমর্ম উপস্থাপনের প্রয়াস পাব।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রিয় সাহাবীয়া হযরত উম্মে হুমাইদ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে এসে আরয করেন-

يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك، فقال قد علمت أنك تحبين الصلاة معى، وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى حجر تك، وصلاتك فى حجر تك خير من صلاتك فى دارك، وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك، وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجدى ـ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সঙ্গে নামায পড়ার প্রতি আমার খুবই আগ্রহ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বলেন, তুমি আমার সাথে নামায আদায় করতে আগ্রহী তা আমি বুঝতে পেরেছি। তবে জেনে রাখো, তোমার আপন শয়ন কক্ষে নামায পড়া ঘরের যেকোনো স্থানে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। তোমার ঘরে নামায পড়া বাড়ির অন্য স্থানে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। তোমার বাড়িতে নামায পড়া তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করা আমার সাথে মসজিদে নববীতে এসে নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। (ইবনে হিব্বান হা.নং-২২১৭, আহমদ ৬/৩৭১)

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম হায়সামী (রহ.) এই হাদীসের সব বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ-২/৩৪)

অপর হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها، وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها۔

মহিলা তার নিজস্ব ঘরে নামায পড়া অপেক্ষা তার শয়ন কক্ষে নামায আদায় করা শ্রেষ্ঠ। আর শয়ন কক্ষের যেকোনো স্থানে নামায পড়া অপেক্ষা তার শোয়ার স্থানে নামায পড়া শ্রেষ্ঠ। (আবু দাউদ হা. নং-৫৬৯)

ইমাম হায়সামী বলেন, উক্ত হাদীসের সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। (মাজমা-২/৩৪)

আম্মাজান হযরত উম্মে সালমা (রা.) নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন-

خير مساجد النساء قعر بيوتهن

মহিলাদের আপন ঘরের ভিতরে নির্জন কক্ষ হলো তার শ্রেষ্ঠতম মসজিদ। (আহমদ ৬/২৯৭, হা. ২৬৫৪২ সনদ হাসান)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন-

إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، ما تكون من وجه ربها وهى فى قعر بيتها

মহিলাগণ অবশ্যই সংরক্ষণযোগ্য। তারা

যখনই বের হয় শয়তান তাদের দিকে চোখ তুলে তাকায়। তাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ উপায় হলো আপন ঘরের ভিতরে নির্জন স্থানে থাকা। (তিরমিযী হা. ১১৭৩, ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, হাদীস হাসান)

উপরোক্ত হাদীসসমূহের মতো আরো অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীসে মহিলাদের নামাযের জন্য শ্রেষ্ঠ ও উত্তম স্থানের দিক নির্দেশনা রয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলে দিয়েছেন মহিলাদের নামাযের উত্তম স্থান। দুনিয়ার সব বিষয়ে মানুষ ভালো-মন্দ বুঝে। বুঝে কোন পথে পা বাড়ালে তার লাভ হবে। সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ ভালো কিছু অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা করে থাকে, ভালো দিক প্রাধান্য দিতে কেউ কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করে না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে, এক শ্রেণীর কথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় জেনে-বুঝে মুসলিম সমাজকে অবণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিপথগামী করছে সরলমনা মুসলমানদেরকে। জানি না এতে তাদের কী লাভ? কী তাদের স্বার্থ?

সংশয়ের অবসান :

সাম্প্রতিককালে কিছু লোক মহিলাদেরকে মসজিদে গিয়ে জামা'আতে নামায পড়ার প্রতি উৎসাহিত করতে শুরু করেছে। কোনো কোনো স্থানে মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার জন্য বাধ্যও করা হচ্ছে। তাদের মতে মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুম'আর নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করতে হবে। ঈদের নামায আদায় করতে হবে ঈদগাহ গিয়ে, সবার সাথে। তাদের দাবি হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মহিলারা মসজিদে গিয়ে নামায পড়েছেন। ঈদের নামায পড়েছেন ঈদগাহে গিয়ে। এ ছাড়া এ মর্মে তারা কিছু হাদীসও পেশ করে থাকে। সাহাবী হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

لاتمنعوا إماء الله مساجد الله

"আল্লাহর মসজিদে আগমন থেকে আল্লাহর বান্দীদেরকে বারণ করিও না।" (বুখারী হা. নং-৯০০)

এ বিষয়ে বর্ণিত সব কটি হাদীসের মর্ম প্রায় একই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কোনো মহিলা মসজিদে যেতে চাইলে তাকে বাঁধা দিওনা। এ প্রসঙ্গে বোঝার বিষয় হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো কোনো হাদীসে মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নির্দেশ করেননি বা উৎসাহিতও করেননি। শুধু বাঁধা দিতে নিষেধ করেছেন। সাথে সাথে ভালো-মন্দ দু'টি দিক তুলে ধরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে ঘরের ভিতর নির্জনে শয়ন কক্ষে নামায পড়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যা আমরা এ পরিসরে ইতিপূর্বে নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে আলোচনা করেছি। মোটকথা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদেরকে উৎসাহিত করেছেন এক দিকে, আর তারা বাধ্য করছেন এর বিপরীত দিকে। তাদের এ মতানৈক্য কার সাথে? কী হবে এর পরিণতি?

এ ছাড়া মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ইভ টিজিং ছিল না। ছিল না এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ ও বেহায়াপনার ছড়াছড়ি। র‍্যাব, বিজিবি, পুলিশ বাহিনী ও মন্ত্রীরা সবাই আজ হিমশিম খাচ্ছে ইভ টিজিং নামক মহামারি নিয়ন্ত্রণ করার অভিযানে। রাজপথে, বিশাল বিশাল জনসভায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে অপহরণ ও উত্যক্ত করার ঘটনা বর্তমানে নিত্যদিনের ব্যাপার। এই পরিস্থিতিতে একটি অনিয়ন্ত্রিত মসজিদ, ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা বা খোলা মাঠে ঈদের নামায পড়ার জন্য মহিলাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলে কী অবস্থা হবে, তা ভেবে দেখার বিষয়। সওয়াব কত হবে, আর গুনাহ কী পরিমাণ সঞ্চয় হবে? অপহরণ ও ইভ টিজিং থেকে কে রক্ষা করবে? এসব আমাদেরকে হিসাব করতে হবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা.) বলেন-

لو أدرك رسول اللّٰه ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن

"মহিলারা আজ যেসব কর্মকাণ্ড জন্ম দিচ্ছে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি তা প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে নিষেধ করতেন।" (বুখারী হা. ৮৬৯, মুসলিম হা. ৪৪৫)

আম্মাজান আয়েশা (রা.)-এর এই বাণী চৌদ্দশত বছর পূর্বেকার তখনকার পৃথিবীর আলোকেই তিনি মহিলাদের প্রতি এ নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। আমরা আজ একটি মডেল যুগের অধিবাসী। ইভ টিজিং, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ আর অশ্লীলতা আমাদের সমাজের অঙ্গ হিসেবে রূপ নিয়েছে। এই সমাজে মহিলাদেরকে বাহিরে আসা, সহাবস্থান ও যৌথ কোনো কাজের প্রতি উৎসাহিত করা মানেই তাদেরকে অপমান করার একটি গভীর ষড়যন্ত্র এবং দুর্ভিসন্ধির নামান্তর মাত্র। তাই এ ধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত থেকে মুক্তির একই পথ, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করে একই সুরে মহিলাদেরকে আপন আপন ঘরে নামায আদায় করার প্রতি উৎসাহিত করি। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক নির্দেশিত মহিলাদের শ্রেষ্ঠ মসজিদ, নিজ নিজ শয়নকক্ষে নামায পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করি। যথাযথ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করি। আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সব ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করুক। আমীন!

যাকাত

ফাজায়েল, আহকাম ও মাসায়েল

মুফতী শাহেদ রহমানী

ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব :

ইসলাম একটি শাশ্বত জীবন বিধান। যাকাত ইসলামের একটি অন্যতম স্তম্ভ। সামাজিক স্থিতিশীলতা, ভারসাম্যপূর্ণ ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম মাধ্যম। সর্বোপরী ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম আয়ের উৎসও এটি। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান বিত্তশালীগণ এ সম্পর্কে অজ্ঞতায় অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকায় কিংবা জেনেও অবহেলা বশত: এড়িয়ে যাওয়ায় মুসলিম সমাজ আজ দারিদ্র্যতা ও দুর্দশায় নিপীড়িত। একদিকে ধনিক শ্রেণী দিন দিন ধনী হচ্ছে অন্যদিকে দরিদ্র শ্রেণী আরো দারিদ্র্যতায় তলিয়ে যাচ্ছে।

সাহিবে নিসাব অর্থাৎ নির্ধারিত পরিমাণ ধনসম্পদের অধিকারী ব্যক্তির জন্য যাকাত আদায় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরজ । এই কারণেই পবিত্র কোরআনের প্রায় (অধিকাংশের মতে) ৩২ স্থানে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ একত্রে এসেছে। তাই তো নিষ্ঠাবান মুমিনের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে এরশাদ হয়েছে : 'যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে'। যাকাত অস্বীকার করার দ্বারা ঈমান চলে যায়। আর যাকাতের ফরযিয়াত স্বীকার করে তা আদায় না করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। (সূরা: নামল, আয়াত: ৩,)

যাকাত কাকে বলে?

* যাকাতের শাব্দিক অর্থ : পবিত্রতা, বৃদ্ধি, কোনো জিনিসের উত্তম অংশ। ইসলামী গ্রন্থসমূহে এই তিনটি অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

* পারিভাষিক অর্থ : শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সম্পদের একটি অংশ কোনো ফকির বা গরিব মুসলমানকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মালিক বানিয়ে দেয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত বলে। (ফাতওয়া শামী,৩/১৭১)

যাকাতের গুরুত্ব:

সামর্থ্যবান সকল মুসলমানদের নিয়মিত যাকাত আদায় করা ফরজ। যাকাত অস্বীকারকারী কাফির। যাকাত দিতে অস্বীকার করায় আবু বকর সিদ্দিক (রা.) যুদ্ধ করেছেন।

পবিত্র কুরআনের আলোকে যাকাত :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত নং-১১০)।

এ ছাড়াও সূরা আত-তাওবাহ ১১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

"অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।"

যাকাত ধনসম্পদকে পবিত্র করে। এ সম্পর্কে কুরআনে রয়েছে–

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

অর্থ: তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং এর মাধ্যমে সেগুলোকে বরকতময় করতে পার। (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত নং-১০৩)।

কুরআনের শিক্ষা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র বাণীতে নামাযের পর যে দায়িত্বটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণরূপে অর্পিত হয়েছে সেটি হচ্ছে যাকাত। নামায বান্দার প্রতি আল্লাহর প্রাপ্য এবং যাকাত বান্দারই প্রাপ্য। এ দুটি বিষয়কে পাশাপাশিভাবে বর্ণনা করত: এ কথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছে যে, ইসলাম আল্লাহর প্রাপ্যের সাথে বান্দার প্রাপ্যের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করেছে। যাকাতের কথা পবিত্র কুরআনে অধিকাংশের মতে ৩২ বার উল্লেখ রয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় এর গুরুত্ব কতটুকু ।

হাদীসের আলোকে যাকাত :

وعن ابى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ خمسٌ مَن جاء بهنَّ مع إيمانٍ دخل الجنة :مَن حافظَ على الصلواتِ الخمسِ، على وضوئهنَّ وركوعِهنَّ وسجودهنَّ ومواقيتِهنّ ، وصامَ رمضانَ، وحجَّ البيتَ إن استطاع إليه سبيلاً ، واعطى الزكاةَ طيِّبةً بها نفسُهُ

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পাঁচটি বস্তু ঈমানের সহিত আল্লাহর দরবারে নিয়ে আসবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামায গুরুত্বের সহিত আদায়

করবে। ২. অজু, রুকু, সিজদা সুন্দরভাবে করবে এবং সময়মত আদায় করবে। ৩. রমাজানে রোযা রাখবে। ৪. সামর্থ্য থাকলে হজ্ব করবে। ৫. সন্তুষ্টচিত্তে যাকাত আদায় করবে। (তাবরানী)

وعن جابر رضى الله عنه قال :قال رجل :يا رسول الله ارايت إنْ ادَّى الرجلُ زكاةَ مالِه؟ فقال رسول الله ﷺ مَن ادّى زكاةَ مالِه:فقد ذهب عنه شَرُّه

"হযরত জাবের (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করল তার ব্যাপারে আপনি কী বলেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করল তার মালের অমঙ্গল দূর হয়ে গেল। (সহীহে ইবনে খুযাইমা)

যাকাত না দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতি :

যথাযথভাবে যাকাত আদায়ের মাঝে যেমন অনেক ফজীলত ও উপকারিতা রয়েছে তেমনিভাবে যাকাত আদায় না করার উপর ভীষণ শাস্তি ও বিভিন্ন ক্ষতির কথাও উল্লেখ রয়েছে।

* কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.

(তরজমা) যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা রাখে এবং তা আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করে না তাদেরকে আপনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। যে দিন সেগুলো উত্তপ্ত করে তা দ্বারা তাদের মুখমণ্ডল, পার্শ্ব ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে (এবং বলা হবে) এগুলো তোমাদের সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য কুক্ষিগত করে রেখেছিলে। এখন তোমরা নিজেদের অর্জিত সম্পদের স্বাদ আস্বাদন করো। (সূরা বাকারা : ৩৪-৩৫)

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعنى بشدقيه يقول أنا مالك، أنا كنزك.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা যাকে ধনসম্পদ দিয়েছেন সে যদি তার সম্পদের যাকাত আদায় না করে তাহলে তার সম্পদকে কিয়ামতের দিন টাকপড়া বিষধর সাপের রূপ দেওয়া হবে। যার চোখের উপর দুটি কালো দাগ থাকবে। কিয়ামতের দিন সেই সাপকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। এরপর সাপ তার মুখে দংশন করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চয়। (সহীহ বুখারী ১/১৮৮)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস ছাড়া আরো অনেক হাদীসে যাকাত না দেওয়ার ভয়াবহ শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

যাকাতের মূল উদ্দেশ্য :

যাকাতের বিধান আরোপিত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য তিনটি যথা:- ১. গরিবের প্রয়োজন পূর্ণ করা। অভিশপ্ত পুঁজিতন্ত্রের মূলোৎপাটন করা, অর্থসম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার মানসিকতাকে খতম করা এবং সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা। ২. অর্থনৈতিক কল্যাণের পথ প্রশস্ত করার জন্য নিজের কষ্টোপার্জিত সম্পদকে বিলিয়ে দেয়ার পবিত্র চেতনাকে অনুপ্রাণিত করা। ৩. যাকাত আদায়ের দ্বারা শ্রমবিষণ্নতা অবসান ঘটানো, আত্মশক্তি অর্জন করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা।

যেসব সম্পদের ওপর যাকাত দিতে হয় :

সাধরণত ওই সকল সম্পদেরই যাকাত দিতে হবে, যা বর্ধনশীল বা পরিবর্ধনের যোগ্যতা রাখে। এরই ভিত্তিতে নিম্নোল্লিখিত সম্পদে যাকাত দিতে হবে। যথা:-

১. নগদ মুদ্রা, সোনা-রুপা।

২. প্রাণী। এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো প্রাণীগুলো বংশবিস্তারের জন্য লালন করা হয়, এমন হতে হবে। সাথে সাথে বছরের অধিকাংশ সময় চারণভূমি থেকে আহার গ্রহণ করে।

৩. কৃষিজাত পণ্য। তবে কৃষিজাত উৎপাদনের যাকাত ওশর রূপে আদায় করতে হয়।

মৌলিকভাবে যাকাতযোগ্য সম্পদ তিন ধরনের যথা: ১. স্বর্ণ রুপা ২. নগদ মুদ্রা ৩. ব্যবসায়িক পণ্য।

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ :

ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি–

১. মুসলমান হওয়া। ২. আযাদ তথা স্বাধীন হওয়া। ৩. সাবালক হওয়া। ৪. সুস্থমস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া। ৫. সম্পদের পূর্ণ মালিক হওয়া।

সম্পদ সম্পর্কিত শর্তসমূহ :

১.সম্পদ নেসাব পরিমাণ হওয়া। ২. সম্পদ নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া। ৩. সম্পদ ঋণমুক্ত হওয়া। ৪. সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া। (তাতারখানিয়া৩/১৩৩,১৩৫,হিন্দিয়া ১/১৭১,১৭২,১৭৪, ফাতওয়া শামী ৩/১৮৪,১৮৯)

যাকাত আদায় কখন কিভাবে আবশ্যক হবে ?

পূর্বোল্লিখিত শর্তসহ যখন কোনো

ব্যক্তির মালিকানায় নেসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ একটি বৎসর অতিবাহিত হবে, তখন সেই সম্পদের যাকাত প্রদান করা তার উপর আবশ্যক হয়ে যাবে।

সুতরাং যে যখন নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে, তখন থেকে চন্দ্র মাস হিসেবে এক বৎসর পূর্ণ হলেই যাকাত দেয়া ফরজ হবে। এটা রমাজান মাসও হতে পারে আবার অন্য মাসও হতে পারে। রমাজান মাসের সাথে যাকাত প্রদানের কোনো সম্পর্ক নেই।

কেউ যদি রমাজান মাসের ফজীলত হাসিলের নিয়াতে রমাজানে যাকাত আদায় করতে চায় করতে পারে। কিন্তু বৎসর পূর্ণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রমাজান মাসের অপেক্ষায় যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। (বাদায়ে ২/১০০,হিন্দিয়া ১/১৮৫ তাতারখানিয়া ৩/১৩৪)

নেসাবের পরিমাণ :

স্বর্ণের নেসাব হলো বিশ মিছকাল তথা ৭.৫ ভরি/তোলা = ৮৭.৫১৪ গ্রাম প্রায়। আর রুপার নেসাব হলো দুই শত দিরহাম তথা: ৫২.৫ ভরি/তোলা, ৬১২.৬০২ গ্রাম প্রায়। এ ছাড়া বাকি অন্যান্য ব্যবসার সম্পদের নেসাবের ক্ষেত্রে নেসাব হলো স্বর্ণ বা রুপার উক্ত পরিমাণের মূল্যের সাথে মিলানো, দুই শত দিরহাম রুপার যে বিক্রয়মূল্য সে পরিমাণ যদি কারো ব্যবসায়ী সম্পদ থাকে তাহলে সেই ব্যবসার মালের উপর যাকাত ফরজ হবে।

(আলবাদায়ে ২/১০০ আদদুররুল মুখতার ৩/২২৪, ফাতওয়া শামী ৩/২২৪)

ব্যবহৃত অলংকারের উপর যাকাত :

কারো মালিকানায় যদি শুধুমাত্র সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণালংকার থাকে এবং সে ঋণী না হয় তাহলে ওই অলংকারেরও যাকাত দিতে হবে। মহিলাদের উক্ত পরিমাণের অলংকার থাকলে তার উপর যাকাত ফরজ হবে। তবে মহিলার পক্ষে স্বামী অথবা অন্য কেউ অনুমতি সাপেক্ষে তার যাকাত আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে। অলংকার ছাড়া যদি তার আর কোনো সম্পদ না থাকে তাহলে উক্ত স্বর্ণের যাকাত পরিমাণে অংশ বা আংশিক বিক্রি করে হলেও যাকাত দিতে হবে।

(ফাতওয়া শামী ২/২৯৮, খাইরুল ফাতওয়া৩/৩৫৮,তাতারখানিয়া ৩/১৫৪.হিন্দিয়া ১/১৭৮)

কিছু স্বর্ণ-রুপা ও কিছু টাকার যাকাত আদায় প্রসঙ্গে :

কারো নিকট কিছু স্বর্ণ-আর কিছু রুপা অথবা নগদ টাকা রয়েছে কিন্তু কোনোটাই নেসাব পরিমাণ নয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে দেখা হবে, যে পরিমাণ স্বর্ণ আছে তা বিক্রি করলে যদি স্বর্ণের বিক্রয় মূল্য ও নগদ টাকা রুপার যাকাতের নেসাব হয়ে যায় তাহলে ওই ব্যক্তির উপর উক্ত মূল্য ধরেই যাকাত প্রদান করা আবশ্যক হবে। (ফাতওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ: ৬, ৫০, ১১৭, ১২৭, রদ্দুলমুহতার: ২/২৯৬, তাতারখানিয়া ৩/১৫৮, হেদায়া ১/১৮৫, ১৮৬)

যাকাতের পরিমাণ :

নেসাব পরিমাণ সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যা শতকরা আড়াই ভাগ হয়। এই পরিমাণ ফকিরকে দেয়া আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, যাকাতের হিসাব আনুমানিক নয় বরং নিশ্চিত হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

(বাদায়ে ২/১০৬,তাতারখানিয়া ৩/১৫৫, হিন্দিয়া ১/১৭৯)

স্বর্ণ-রুপার যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্যই বিবেচ্য হবে :

কারো নিকট যদি স্বর্ণ বা রুপার অলংকার থাকে তাহলে তা আদায়কালীন বাজারদর হিসেবে যে মূল্য পাওয়া যাবে সেই মূল্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেওয়া আবশ্যক। এ ধরনের স্বর্ণ বা রুপা ক্রয় করতে গেলে কত মূল্য আসবে, তা ধর্তব্য নয়। (ফাতওয়া মাহমুদীয়া: ১৩/৯৬, দারুল উলুম: ৬/১০৮বাদায়ে ২/১৯০,তাতারখানিয়া ৩/১৬৫, হিন্দিয়া ১/১৮০)

ভূমি, প্লট বা ফ্ল্যাটের যাকাত :

ভূমি, প্লট বা ফ্ল্যাটের যাকাতের বিধান ক্রয়কারীর নিয়তের উপর নির্ভর করবে।

১. যদি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তা ক্রয় করা হয়, তাহলে তাকে প্রতিবছর ভূমি বা প্লট ইত্যাদির বাজার মূল্য বিবেচনা করে যাকাত দিতে হবে। যেমন, কেউ যদি ৫০ লাখ টাকায় ৫টি প্লট ক্রয় করে বছর শেষে যদি উক্ত প্লটগুলোর বাজার মূল্য ৭০ লাখ টাকা হয়ে যায়, তাহলে তাকে ৭০ লাখ টাকার যাকাত দিতে হবে।

২. যদি নিজের বসবাসের জন্য ক্রয় করা হয়। তাহলে উক্ত প্লটের যাকাত দিতে হবে না।

(আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, ৩/২৮৪)

দোকানের পণ্যের যাকাত :

দোকানের ডেকোরেশন, আলমারি, তাক ইত্যাদি পণ্যের উপর যাকাত ফরজ নয়, বরং বিক্রি করার জন্য যেসব পণ্য মওজুদ আছে তার মূল্য যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত ফরজ হবে। যাকাতের হিসাব করার পদ্ধতি হলো, বৎসরের একটা সময় দিন-তারিখ নির্ধারণ করে দোকানে মওজুদ পণ্যের মূল্যের

হিসাব করে দেখবে। এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় পণ্যের মূল্য হিসাব করে দেখবে। বৎসরের শুরুতে পণ্যের মূল্য নেসাব পরিমাণ ছিল এবং বৎসর শেষেও যদি মওজুদ পণ্যের বাজারদর নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার যাকাত দিতে হবে।

(তাতারখানিয়া ৩/১৬৯ হিন্দিয়া ১/১৮০, দুররুলমুখতার ৩/১৮২)

গাড়ি, লঞ্চ, উড়োজাহাজ ইত্যাদির যাকাত :

গাড়ি, লঞ্চ ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশে ক্রয় করে থাকতে পারে। গাড়ি, লঞ্চ, উড়োজাহাজ, হেলিকপ্টার ইত্যাদি কেউ যদি নিজস্ব ব্যবহারের জন্য অথবা ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য ক্রয় করে থাকে তার উপর যাকাত দিতে হবে না। আর যদি কেউ উল্লেখিত বস্তু বিক্রয় করে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশে ক্রয় করে থাকে তাহলে যাকাত আদায়কালীন বাজারদর হিসেবে যাকাত দিতে হবে। (আদ্দুররুলমুখতার ৩/১৯২ তাতারখানিয়া ৩/১৯৭, কাযী খান ১/১৫০)

ব্যাংকে সঞ্চয়কৃত টাকার যাকাত :

কোনো ব্যক্তি সঞ্চয়ের জন্য যদি ব্যাংকে টাকা জমা রাখে তাহলে ঋণমুক্ত অবস্থায় যেদিন তার জমাকৃত টাকা নেসাব পরিমাণ হবে, সেদিন থেকে এক বৎসর পূর্ণ হলে ওই টাকার উপর যাকাত ফরজ হয়ে যাবে। (আলমগীরি:১/২৭০ মাহমুদিয়া: ৩/৫৭)

ব্যাংক লোনের টাকা দিয়ে তৈরি ফ্যাক্টরির উপর যাকাত :

যদি কেউ হাজতে আসলিয়া অর্থাৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু যথা বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র, ঘরের আসবাবপত্র, যানবাহন ইত্যাদি ব্যতীত ঋণ নিয়ে এমন বস্তু ক্রয় করে যার উপর যাকাত আসে না, যেমন মিল, কারখানা, মেশিনারি, তখন উক্ত ঋণ যাকাতের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। তাই এই ধরনের ঋণ থাকা সত্ত্বেও সম্পদ যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে। (বাদায়ে ২/৮৬)

পাওনা টাকার উপর যাকাত :

পাওনা টাকা উসূল হওয়ার পর উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে এবং বিগত বছর সমূহে উক্ত টাকার যাকাত না দিয়ে থাকলে তার যাকাতও দিতে হবে। তবে কেউ যদি পাওনা টাকা উসূল হওয়ার পূর্বে প্রতিবছর উক্ত টাকার যাকাত দিয়ে দেয় তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

(আদদুররুল মুখতার:২/২৬৬ ,দারুল উলুম.৬/৪৫,৭৭)

গরু, বকরি ও মুরগির ফার্মের উপর যাকাত :

ব্যবসার জন্য গরু, বকরির এমনিভাবে পোল্ট্রি ফার্ম করা হয়। এই ফার্মে লালিত-পালিত হয়ে এক পর্যায়ে এসব প্রাণী বিক্রি হয়। এসব প্রাণীর বিক্রয় মূল্য যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে তার যাকাত দেয়া আবশ্যক। (ফাতওয়ায়ে উসমানী ২/৩৯)

যাদের যাকাত দেওয়া যাবে :

কুরআন শরীফে আট শ্রেণীর লোকদের যাকাত দেয়ার বর্ণনা রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের জন্য এবং দাস-মুক্তির জন্য-ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য, এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০)

তবে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও ইমাম মালেক (রহ.)সহ অধিকাংশ ফুকাহাদের মত হলো হৃদয় আগ্রহী করার খাতটা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং বাকি সাত শ্রেণীর লোকদের যাকাত দেয়া যাবে।

১.ফকির : যার মালিকানায় নেসাব পরিমাণ সম্পদ নেই।

২. মিসকীন : যার কোন সম্পদ নেই নিঃস্ব।

৩. ইসলামী সরকার কর্তৃক নিয়োজিত যাকাত উসূলকারী।

৪. দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আর্থিক সহায়তা করা।

৫. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার ঋণ মুক্তির জন্য।

৬.আল্লাহর রাস্তায় যথা হজ্ব বা জিহাদের পথে সম্পদ শূন্য হয়ে গেছে এমন ব্যক্তি।

৭. মুসাফির : যার কাছে বাড়ি পৌঁছার খরচ নেই।

(তাতারখানিয়া ৩য়, ১৯৮পৃ:, হিন্দিয়া ১ম, ১৮৭ পৃ:, বাদায়ে ২য়, ১৫৭ পৃ:)

যাদের যাকাত দেয়া যাবে না :

১. কাফের।

২. নেসাব পরিমাণ মালের মালিক।

৩. নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের নাবালক সন্তান।

৪. বনু হাশেমের লোক।

৫. মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানি এমনি যত উপরের দিকে যাওয়া

হবে।

৬. নিজের ছেলেমেয়ে এবং তাদের সন্তানাদি এমনিভাবে যত নিচে যাওয়া যায়।

৭. স্ত্রী অথবা স্বামী

৮. মসজিদ-মাদ্রাসা, পুল, রাস্তা, হাসপাতাল বানানোর কাজে যাকাতের টাকা এমনিভাবে মৃতের দাফনের কাজে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে না। (হিন্দিয়া ১ম,১৮৮,১৮৯পৃ:, তাতারখানিয়া ৩য়,২০৬পৃ:, আদদুররুল মুখতার ৩য়,২৯৪, ২৯৫ পৃ:)

ভাইবোনকে যাকাত দেওয়া :

সহোদর ভাইবোন যেহেতু উসূল বা ফুরু, অর্থাৎ যাকাত দাতার মূল বা শাখা নয়, বিধায় তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে। এমনিভাবে কাপড় কিনে দিলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অন্তরে যাকাতের নিয়্যাত রেখে মুখে তা উল্লেখ না করে এমনিতে দিয়ে দিলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অথবা হাদিয়া বলেও দিতে পারবে। এতে অসুবিধা নেই বরং এটা উচিত। তবে যাদেরকে দেয়া হচ্ছে তারা গরিব বা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হতে হবে। (হিদায়া: ১ খণ্ড ২০৬ পৃষ্ঠা, বাদায়ে : ২ খণ্ড ৪৯ পৃষ্ঠা)

নিজ মেয়ের জামাইকে যাকাত দেয়ার হুকুম :

মেয়েকে বিবাহ দেয়ার পর তার খোরপোষ ইত্যাদি দেয়া তার স্বামীর দায়িত্ব। আর মেয়ের জামাই যেহেতু যাকাত দাতার মূল ও শাখার (উসূল ও ফুরূর) অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই জামাইকে যাকাত থেকে সাহায্য করা যাবে। নিজের গরিব আত্মীয়স্বজনকে যাকাত দেয়ার অধিক ফজীলতের কথা হাদীসে উল্লেখ আছে। তবে তাদেরকে যাকাতের মাল হাদিয়া বলে দেয়া নিয়ম, যাতে যাকাতের কথা শোনার কারণে তাদের মনে ব্যথা না লাগে। জামাইকে যাকাত প্রদান করার পর সে উক্ত টাকার মালিক হয়ে নিজের সংসারের যেকোনো জরুরতে খরচ করতে পারবে। কিন্তু সরাসরি মেয়েকে বা মেয়ের সন্তানাদিকে যাকাত-ফিতরা দেয়া জায়িয হবে না। মেয়েকে বা তার সন্তানাদিকে কিছু দিতে চাইলে, তা যাকাত থেকে নয়, বরং আসল মাল থেকে হাদিয়া হিসেবে দিতে হবে। আল বাহরুর রায়েক: ২ খণ্ড ৪২৫ পৃষ্ঠা, আহসানুল ফাতওয়া, ৪ খণ্ড ২৬৯ পৃষ্ঠা, মাআরিফুল কুরআন: ৪ খণ্ড ৪১২ পৃষ্ঠা।

যাকাতের মাল জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা :

যাকাতের মাল শুধুমাত্র গরিবদের ব্যক্তিমালিকানায় দিয়ে দিলেই যাকাত আদায় হয়।সুতরাং মসজিদ, হাসপাতাল, রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট, হাসপতাল নির্মাণের ক্ষেত্রে যাকাতের মাল খরচ করা যাবে না। কারণ এসব ক্ষেত্রে যাকাতের মালে ব্যক্তি বিশেষকে মালিক বানিয়ে দেয়া হয় না। রাসূল (সা.) হযরত মু'আয (রা.) কে বলেছেন, এ সম্পদ ধনীদের থেকে গ্রহণ করো এবং ফকিরদের মধ্যে বিতরণ কর। ধনীদের থেকে গ্রহণ করে ফকিরদের মধ্যে বিতরণ করার কথা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তাদেরকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না। (খাইরুল ফাতওয়া:২/৩৮৮, তাতারখানিয়া ৩/১৯৮,২০৮, আদদুররুলমুখতার ৩/১৭১-১৭৩, রদ্দুল মুহতার ৩/১৭১)

সদকা ও যাকাতের বেশি হকদার কারা :

সদকায়ে ওয়াজিব। অর্থাৎ, যাকাত, ফিতরা বা কুরবানীর চামড়ার মূল্য এমনিভাবে নফল দানের সবচেয়ে বেশি হকদার গরিব তালিবে ইলম। তারপর গরিব আত্মীয়স্বজন, অত:পর সাধারণ গরিব।

যেহেতু ফুকাহায়ে কিরামের বর্ণনা মতে ফজীলতের ক্ষেত্রেও তালিবে ইলমদেরকে দান করলে ৩ গুণ সাওয়াব (অর্থাৎ দান, দ্বীনের সহায়তা ও সদকায়ে জারিয়ার সাওয়াব) পাওয়া যাবে।

পক্ষান্তরে গরিব আত্মীয়দের দান করলে ২ গুণ সাওয়াব (অর্থাৎ দান করা, ও আত্মীয়তা রক্ষা) এবং সাধারণ গরিবদের বেলায় শুধু যাকাতের সওয়াব পাওয়া যাবে। (সূরা বাকারা, আয়াত, ২৭৩)

যাকাত ও রমাজান

নিসাব পরিমাণ সম্পদের উপর এক চন্দ্রবছর অতিবাহিত হলেই সেই সম্পদের যাকাত দেওয়া ফরয। যাকাত ফরয হওয়ার পর দ্রুত আদায় করতে হবে। কিন্তু কোনো কোনো লোককে দেখা যায়, তাদের যাকাতবর্ষ রমাজান মাসের আগে, এমনকি ৪-৫ মাস আগে হয়ে যায় এরপরও তারা তখন যাকাত আদায় করে না; বরং রমাজানের অপেক্ষা করতে থাকে। এমনটি করা আদৌ উচিত নয়। বরং গরিবের পাওনা যত দ্রুত আদায় করা যায় ততই শ্রেয়। তাই বিলম্ব না করে দ্রুত আদায় করে দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, যাদের যাকাতবর্ষ রমাজান মাসে পূর্ণ হয় তারা রমাজানে যাকাত আদায় করতে পারবে।

কোয়ান্টাম মেথড-১৬

বদলে গেছে লাখো জীবন!!

মুফতী শরীফুল আ'জম

কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ফলে নাকি "বদলে গেছে লাখো জীবন!" এটা তাদের জোড়ালো দাবি। কিন্তু কিভাবে বদলে গেল? কী পেয়ে বদলে গেল? বদলে গিয়ে কী হলো? আর যা হলো তা আসলেই কাম্য কি না? জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিচ্যুত মানুষেরা যদি ওই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের দরুন পথের দিশা পেয়ে থাকে তবে তো এই দাবি বাস্তব ও সার্থক। আর যদি তা না হয়ে উল্টো ঈমান-আমল ধ্বংস হয়ে বসে, তবে দাবিটি নিছক ধোঁকা বলে সাব্যস্ত হবে। যাদের জীবন বদলে গেছে বলে দাবি করা হচ্ছে এমন লোকদের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোয়ান্টামের বিভিন্ন স্মারক, বুলেটিন ও বই-পুস্তকে অনেকের সাফল্যগাথা মন্তব্য-বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোকে সংকলন করে "কোয়ান্টাম ভাবনা সাফল্যগাথা" নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে সকলে একই সুরে গেয়ে গেছে নিজেদের প্রাপ্তির অনুভূতির কথা। মোট পাঁচ ধরনের প্রাপ্তির কথা ঘুরেফিরে সকলের কথার মাঝে ফুটে উঠেছে। সুস্বাস্থ্য, প্রাচুর্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সুখী পরিবার। একজন মানুষের সফল জীবনের জন্য এই পাঁচ বস্তুর অপরিহার্যতা কতটুকু, আর এগুলো না থাকলে ব্যার্থতার মাত্রা কতটুকু বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া চাই। জীবনের সাফল্য বা ব্যার্থতা নির্ণয়ের জন্য জীবনের উদ্দেশ্য জানা থাকতে হবে। যদি বলা হয় মানবজীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী করে মাওলার গোলাম হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করা। তবে এমন জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা ঈমান-আমলের ভিত্তিতে নির্ণিত হবে। আর যদি পার্থিব যশ-খ্যাতি আর আনন্দ-ফুর্তিকে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মনে করা হয়, তবে ওই পাঁচ বস্তুই হবে সাফল্যের প্রতীক। এগুলো পেলেই জীবন সফল ও সার্থক মনে হবে। জীবন বদলে গেছে বলে দাবি করা সহজ হবে। এমন সাফল্যের জন্য সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানেরও প্রয়োজন হবে না। যার যার ধর্ম পালন করেও এমন সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে। কিন্তু চোখ বন্ধ হলেই মরীচিকার মতো সকল সাফল্য সকল প্রাপ্তি শূন্যে মিলিয়ে যাবে। জীবন বদলে যাওয়ার দাবি মিছে প্রমাণিত হবে। কোয়ান্টামের ধোঁকা-প্রতারণা ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু তখন আফসোস করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না। ফিরে এসে জীবনটাকে বদলে ফেলার লাখো আকুতি শোনা হবে না।

কোয়ান্টাম মানবজাতিকে এই সর্বনাশা পথে ঠেলে দিতেই পার্থিব খ্যাতি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। জীবনের লক্ষ্য অধ্যায়ে বলা হয়েছে–

প্রশ্ন: জীবনের লক্ষ্য বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: জীবনের মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে আমার আগমনকে অর্থবহ করা। আর তার উপায় হলো নিজেকে জিজ্ঞেস করা যে, কেন এসেছি আমি, কী করতে চাই। একটাই তো জীবন। জীবনটাকে কিভাবে উপভোগ করতে চাই। সময়টাকে কিভাবে ব্যয় করতে চাই।

চারপাশের মানুষের কাছ থেকে আমি কী চাই? তাদেরকে কী দিতে চাই? এ প্রশ্নগুলোর উত্তরই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য। এর আরো সহজ উপায় হচ্ছে মিডিয়ায় নিজের মৃত্যু সংবাদ কিভাবে দেখতে চাই, শুনতে চাই সেটাকে অবলোকন করা। কারণ একজন কীর্তিমান মানুষের মৃত্যু সংবাদেই থাকে তার জীবনের সব অবদানের কথা। (হাজারো প্রশ্নের জবাব, মহাজাতক ১/২৬২)

কোয়ান্টামের মতে জীবনের উদ্দেশ্য মিডিয়াতে মৃত্যু সংবাদ ফলাও করে প্রচার পাওয়ার মতো খ্যাতি বা কৃতিত্ব অর্জন করা। কোনো মু'মিন মুসলমানের বক্তব্য এমন হতে পারে না। এমন কথা সেই বলতে পারে যার আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান নেই। 'একটাই তো জীবন' কথাটির অর্থই হচ্ছে পরকালের জীবন অস্বীকার করা। মুমিন-মুসলমানের বক্তব্য হচ্ছে পার্থিব এ জীবনের পরে চিরস্থায়ী আরেকটি জীবন রয়েছে। পরকালীন সেই জীবনের সুখ-শান্তির পুঁজি আহরণ হচ্ছে ইহকালের এ জীবনের লক্ষ্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয যারিয়াত-৫৬)

তাই জীবনের লক্ষ্য পার্থিব খ্যাতি অর্জন নয় বরং আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীই হচেছ মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

তাহলে ওই পাঁচ বস্তু পেয়ে জীবন বদলে যাওয়ার দাবিটি একটি ধোঁকা সাব্যস্ত হলো। ঈমান-আমল ছাড়া এ সকল অর্জন চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে ধোপে টিকবে না এ কথা নিশ্চিত। পবিত্র কুরআন থেকে পাঁচটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

সুস্বাস্থ্য :

কোয়ান্টামের ফর্মুলা মেনে চলায় অনেকে দীর্ঘ দিনের রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাময় লাভ করেছে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ায় জীবন বদলে গেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। দৈহিক সুস্থতাকে জীবনের চরম প্রাপ্তি হিসেবে গণ্য করছে। সুস্থতা একটি অমূল্য নেয়ামত এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঈমান-আমল বাদ দিয়ে শারীরিক সুস্থতাকে সাফল্যের ভিত্তি মনে করার অবকাশ নেই। দেহ সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হলো কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনিত ধর্ম মেনে দেহ পরিচালিত হলো না তবে এই সুস্থ দেহ জাহান্নামের লাকড়িতে পরিণত হবে। কওমে আদ যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পবিত্র কুরআনে তাদের ইতিহাস ও পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আদ প্রকৃতপক্ষে নূহ (আ.)-এর পুত্র সামের বংশধরের এক ব্যক্তির নাম। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপুসম্পন্ন। দৈহিক আকার-আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ(٨)

" আপনি লক্ষ্য করেননি। আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কী আচরণ করেছিলেন। যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোনো লোক সৃজিত হয়নি।"(সূরা আল ফজর ৬-৮)

নিজেদের সুস্বাস্থ্য ও দৈহিক শক্তিমত্তা নিয়ে আদ সম্প্রদায় সদা গর্ববোধ করত। পবিত্র কুরআনে তাদের এই মনোভাব এভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

"যারা ছিল আদ তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে?" (সূরা হা-মীম সিজদাহ-১৫)

সুস্বাস্থ্যের এই নিয়ামত তাদের জন্য সফলতা বয়ে আনার পরিবর্তে কাল হয়ে দাঁড়াল। যে বিশ্ব প্রতিপালকের নিয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল। তারা তাকে পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহর নবী হযরত হুদ (আ.) আদ জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে একত্ববাদের অনুসরণ করতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনৈশ্বর্যের মোহে মত্ত হয়ে তাঁর আদেশ অমান্য করে। এর পরিণতিতে তাদের উপর কঠোর আযাব নাযিল হয়। প্রথমত তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ থাকে। ফলে তাদের শস্যক্ষেত শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আযাব সওয়ার হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও দালানকোঠা ভূমিসাৎ হয়ে যায়। মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে সুঠাম দেহের অধিকারী আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

তাদের এই শোচনীয় পরিণতির কথা পবিত্র কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে-

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (٥٩) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (٦٠)

"এ ছিল আদ জাতি যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতকে অমান্য করেছে, আর তদীয় রাসূলগণের অবাধ্যতা করেছে এবং প্রত্যেক উদ্ধত বিরোধীদের আদেশ পালন করেছে। এ দুনিয়ায় তাদের পিছনে পিছনে লা'নত রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও; জেনে রাখ, আদ জাতি তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে, হুদের জাতি আদ জাতির প্রতি অভিসম্পাত রয়েছে জেনে রাখ।" (সূরা হুদ-৫৯-৬০)

বোঝা গেল, সুস্বাস্থ্য তাদের জীবন বদলে দিতে পারেনি। নবীর আদেশ অমান্য করার ফলে তারা চিরদিনের জন্য অভিসম্পাত কামাই করেছে। কোয়ান্টাম চর্চা কথিত সুস্বাস্থ্য দিতে পারলেও জীবন বদলে দিতে পারবে না। শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ অমান্য করে যার যার ধর্ম পালন করতে থাকলে সুস্থ দেহের অধিকারী হয়েও চরমভাবে ব্যর্থ হতে হবে। 'সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন' এই স্লোগান কোনো কাজে আসবে না।

প্রাচুর্য :

অনেকে কোয়ান্টাম চর্চার ফলে প্রাচুর্যের মালিক হয়েছেন বলে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে। প্রাচুর্যের কারণে তাদের জীবন বদলে গেছে, সফল হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, সফলতা একমাত্র আল্লাহর হুকুম আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ অনুসরণের মাঝে নিহিত রয়েছে। প্রাচুর্যের মাঝে কোনো সফলতা নেই। যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ধনবীর কারুন। প্রাচুর্যের মাঝে ডুবে থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর হুকুম নবীর আদর্শ না মানায় সফল হতে পারেনি। পবিত্র কুরআনে তার ধন-ভাণ্ডারের বিবরণ ও শেষ পরিণতির কথা উল্লেখ হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

"কারুন ছিল মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টুমি করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদের ভালোবাসেন না।" (সূরা আল কাসাস-৭৬)

কারুন এই প্রাচুর্যকে নিজস্ব অর্জন বলে মনে করত এবং বলত- قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي "আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি।" (সূরা আল কাসাস-৭৮)

অর্থাৎ আমি যা কিছু পেয়েছি তাতে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের কোনো দখল নেই। এটা আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্ম তৎপরতার দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্খ কারুন এ কথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা, শিল্প অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য এগুলোও তো আল্লাহ তা'আলারই দান ছিল, তার নিজস্ব গুণ গরিমা ছিল না।

কোয়ান্টামের দাবিও অনেকটা এমনই। মেধার বলেই তাদের প্রাচুর্য লাভ হয় বলে ধারণা দেয়া হচ্ছে। "আমরা মেধাকে সেবায় রূপান্তরিত করছি, বিনিময়ে প্রাচুর্য আসছে।" (হাজারো প্রশ্নের উত্তর মহাজাতক ২/৪১৮)

এ ছাড়া বলা হয়েছে- "প্রাচুর্য প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার।" (কোয়ান্টাম কণিকা-২৫) প্রাচুর্য আল্লাহর দান এমন শিক্ষা কোয়ান্টামে নেই। আর আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়ার মূল কারণ এটাই। নিজের অর্জন আর নিজের অধিকারের কথা ভেবে ধনকুবের কারুন আল্লাহর হুকুম আর ওই যুগের নবী হযরত মূসা (আ.)-এর আদর্শ অনুসরণে বেকে বসল। ব্যস, আল্লাহর আযাব তার জন্য অবধারিত হয়ে গেল। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ

"অতঃপর আমি কারুনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না।" (সূরা আল কাসাস-৮১)

কারুনের প্রাচুর্য কোনো সফলতা বয়ে আনতে পারল না। অর্থ-বিত্তের সাথে সাফল্যের কোনো সম্পর্ক নেই। সফলতা আর ব্যর্থতা ঈমান-আমলের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যার যার ধর্ম পালনের শিক্ষার মাধ্যমে যা আদৌ অর্জন করা সম্ভব নয়। এটা সম্পূর্ণ কুফরী মতবাদ। প্রাচুর্যের প্রলোভন দেখিয়ে কোয়ান্টাম এমন সব কুফরী মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মাঝে প্রচারের সুযোগ নিচ্ছে।

মাল দৌলত আল্লাহর নিয়ামত ও হতে পারে আবার ফেতনার কারণও হতে পারে। ইরশাদ হচ্ছে–

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

"সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হলো এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণ বিয়োগ হওয়া কুফরী অবস্থায়।" (সূরা আত-তাওবা-৫৫)

অতএব প্রাচুর্যের চাকচিক্য দেখে ধোঁকা খাওয়া ঠিক হবে না। আল্লাহ তা'আলা চাইলে নাফরমান খোদাদ্রোহী চিরস্থায়ী জাহান্নামী কেউ সোনা-রুপার অট্টালিকার মালিক বানাতে পারেন। এই প্রাচুর্য সফলতার লক্ষণ নয়। অর্থ-বিত্ত পেয়ে জীবন বদলে গেছে মনে করা একটি ধোঁকা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ

سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (٣٤) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ(٣٥)

"যদি সব মানুষ এক মতাবলম্বী (কাফের) হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্যে রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি। যার উপর তারা চড়ত। এবং তাদের গৃহের জন্য দরজা দিতাম, এবং পালংক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। এবং স্বর্ণ নির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত্র। আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যই যারা ভয় করে।" (সূরা আয যুখরুফ ৩৩-৩৫)

অতএব কোয়ান্টামে কুফরী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে ধন-দৌলতে স্নাত হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখা কোনো মুমিনের কাজ হতে পারে না। প্রাচুর্যের খাতিরে কুফরী মেথড অবলম্বন নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। কোয়ান্টামের ভাইয়েরা নিজেদের অবস্থা ভেবে দেখুন, সত্য ধর্ম ইসলাম বাদ দিয়ে যার যার ধর্মে থেকে প্রাচুর্যবান হওয়ার শেষ ফল কী হতে পারে?

খ্যাতি:

কোয়ান্টাম চর্চা করে অনেকে খ্যাতিমান হয়েছেন বলে নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে পেরেছেন। বিভিন্ন সেলিব্রেটিগণ সফল ক্যারিয়ার গড়তে সক্ষম হয়েছেন। নাচ-গান, অভিনয় ও খেলাধুলা

সহ নানা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এসকল সাফল্যই তাদের মতে জীবন বদলে যাওয়ার মূল উপকরণ। কিন্তু এসকল খ্যাতি অর্জন করতে গিয়ে ঈমান-আমালের মতো অমূল্য সম্পদ বিসর্জন দিতে হচ্ছে কি না, একটু ভেবে দেখা দরকার। পার্থিব এ জীবনে খ্যাতিমান হওয়া বা অখ্যাত হওয়ার সাথে সফলতা বা ব্যর্থতার কোনো সম্পর্ক নেই। মানবজাতির সফলতা আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনুসারে জীবন-যাপনের মাঝে নিহিত রাখা হয়েছে। সামুদ সম্প্রদায় ওই যুগের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মালিক ছিল। নরম মাটিতে বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ আর পাহাড় কেটে ঘরবাড়ি নির্মাণ প্রকৌশলে তারা ছিল বিখ্যাত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"তোমরা স্মরণ করো, যখন তোমাদের আদ জাতির পরে সর্দার করেছেন, তোমাদের পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ করো এবং পর্বত গর্ত খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করো। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।" (সূরা আল আরাফ-৭৪)

কিন্তু তাদের এই খ্যাতি তাদের জন্য কোনো সাফল্য বয়ে আনতে পারেনি। জীবনটাকে বদলে দিতে পারেনি। আল্লাহর নাফরমানীর কারণে গোটা সম্প্রদায় সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহর নবী হযরত সালেহ (আ.)-এর ভবিষদ্ববাণী অনুযায়ী প্রথম দিন তাদের সকলের চেহারা হলুদ রঙে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। এটাই ছিল তাদের জীবনের শেষ দিন। ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হলো এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শোনা গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে ভূশায়ী হলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٧٨) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ(٧٩)

"অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে সকাল বেলায় নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। সালেহ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল; হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি কিন্তু তোমরা মঙ্গলকাঙ্ক্ষীদেরকে ভালোবাস না।" (সূরা আলা আ'রাফ ৭৮-৭৯)

প্রতিপত্তি :

কোয়ান্টাম চর্চার ফলে অনেকে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন বলে জানা যায়। কিন্তু প্রভাব-প্রতিপত্তি জীবনের সাফল্য নয়, আসল সাফল্য হচ্ছে আল্লাহর হুকুম মতে জীবন পরিচালনা করে জাহান্নাম থেকে পরিত্রান পাওয়া ফিরআউনের ঘটনা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে ছিল বিশাল রাজ্যের মালিক। প্রভাব-প্রতিপত্তির কোনো ঘাটতি ছিল না।

وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ

"ফিরআউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল।" (সূরা ইউনুস-৮৩)

ফলে সে নিজেকেই খোদা বলে দাবি

করে বসে। হায়াত-মউতের মালিকও নিজেকে মনে করতে থাকে।

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

"এবং বলল আমি তোমাদের সেরা পালনকর্তা।" (সূরা আন নাযিআত- ২৪)

হযরত মূসা (আ.) তাকে সংযত হতে আহ্বান করেন এবং একত্ববাদের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু এ দাওয়াতকে উপেক্ষা করে সে খোদাদ্রোহীতার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়ে হযরত মুসা (আ.)কে গ্রেফতারের হুমকি দিয়ে বলে–

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

"ফেরআউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।" (সূরা আশ শুআরা- ২৯)

অবশেষে আল্লাহর আযাব তাকে পাকড়াও করে। দলবল, সৈন্য-সামন্তসহ তাকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়। তার সকল প্রভাব-প্রতিপত্তি সেদিন অসার প্রমাণিত হয়। জীবনকে বদলে দেয়ার পরিবর্তে ধ্বংস করে দেয়। ইরশাদ হচ্ছে–

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

"অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম। তৎপর আমি তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখ জালেমদের পরিণাম কী হয়েছে।" (সূরা আল কাসাস- ৪০)

সুখী পরিবার :

কোয়ান্টাম চর্চার ফলে সুখী পরিবার নসীব হয়েছে বলে অনেকে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। কোয়ান্টাম জীবন যাপনের যে বিজ্ঞান চর্চার আহ্বান জানাচ্ছে তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচেছ সুখী পরিবার। "কোয়ান্টাম চেতনার সাফল্য হচ্ছে পরিবারকে সুখী পরিবারে রূপান্তরিত করা। অন্য কোনো চেতনায় আমাদের দেশে এভাবে পারিবারিক রূপ পায়নি।" (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস ১৪৩)

কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে সুখী পরিবার গড়ে জীবন বদলের গান যারা গাইছেন তাদের ভেবে দেখতে হবে, এই সুখ একসময় দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে কি না? কারণ, কোয়ান্টামের যার যার ধর্ম পালনের দৃষ্টিভঙ্গি এক দিকে অমুসলিম পরিবারকে কুফর শিরকে নিমজ্জিত থাকতে উৎসাহ জোগায়। অপরদিকে তাদের বিভিন্ন কুফরী দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানদেরকে সপরিবারে ঈমানহারা করার পথ সুগম করে। ঈমান আমল ছাড়া পার্থিব বিবেচনায় সুখী পরিবারের শেষ পরিণতি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (١١) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٢) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (١٣)

"এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ দিক থেকে দেওয়া হবে, সে মৃত্যুকে আহবান করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে তার পরিবার পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল।" (সূরা আল ইনশিকাক ১০-১৩)

বোঝা গেল পারিবারিক সুখশান্তি আর আনন্দ-ফুর্তি জীবন বদলের মাপকাঠি নয়। ঈমান আমলহীন সুখী পরিবারের শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম। বদলে গেছে লাখো জীবন কথাটি প্রকৃত পক্ষে এমন পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে যারা কুফর শিরক পরিহার করে ঈমান গ্রহণ করেছে এবং সকল প্রকার গোনাহ মুক্ত থেকে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শে পরিবার গড়ে তুলেছে। এমন পরিবারই শেষ বিচারে সুখী বলে সাব্যস্ত হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে –

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (٢٨)

"তারা বলবে আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম তিনি সৌজন্যশীল পরম দয়ালু।" (সূরা আত-তূর ২৬-২৮)

আল্লাহর ভয় নিয়ে যারা জীবন যাপন করে এই হচ্ছে তাদের প্রতিদান। আল্লাহ তাদেরকে সপরিবারে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাতে একত্রে স্থান করে দেবেন। আর এটিই হচ্ছে আসল সফলতা। জান্নাতীদের পরস্পর সাফল্যগাথা ইতিবৃত্তের আলোচনা এই আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। এরাই প্রকৃত সুখী পরিবার। পক্ষান্তরে কোয়ান্টাম যে সুখী পরিবারের দীক্ষা দিচ্ছে তা ঈমানবিনাশী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে চূড়ান্ত সুখ বয়ে আনতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কোয়ান্টামের আদর্শে গড়ে ওঠা সুস্বাস্থ্য, প্রাচুর্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং সুখী পরিবারের মাঝে বাহ্যিকভাবে সফলতা দৃষ্টিগোচর হলেও প্রকৃত পক্ষে এগুলো হচ্ছে ঈমানবিধ্বংসী ফাঁদ। আর 'বদলে গেছে লাখো জীবন' স্লোগানটি হচ্ছে একটি ধোঁকা।

হযরত থানভী (রহ.)-এর
রাজনৈতিক চিন্তাধারা-৩

মুফতী মুহাম্মদ তকী উছমানী

হযরত (রহ.) আরো বলেছেন-

"সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা বিধানের পদ্ধতি এটাই যে, কেউ হবে অনুসরণীয় বা শাসক, কেউ হবে অনুসরণকারী বা শাসিত। কেউ নির্দেশ দিবে আর কেউ তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে। পূর্ণস্বাধীনতার ফল দাঁড়াবে ফেতনা-ফাসাদ। এই জন্যই এখানে এসে গণতন্ত্রবাদীদেরকে আপন দাবি থেকে সরে দাঁড়াতে হয়; কিন্তু ইসলামকে কখনো স্বীয় দাবি থেকে এক চুল নড়তে হয় না। কেননা ইসলাম তো শুরু থেকেই বলেছে- কেউ হুকুম চালাবে; আর কেউ তা পালন করে যাবে। ইসলাম তো অবাধ স্বাধীনতার সবক কখনো শিখায়নি। ইসলামের প্রথম সবকই তো হলো নবীর 'ইত্তিবা-অনুসরণ' করা। আল্লাহ তা'আলা কোনো সময় একসাথে দুই নবী পাঠালেও তাদের একজনকে করেছেন দ্বিতীয়জনের অধীন। যেমন হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.) একই যামানার দুই নবী। যাদেরকে বনী ইসরাইলের প্রতি নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে হযরত মূসা (আ.) ছিলেন মাতবু পথিকৃত। আর হযরত হারুন (আ.) ছিলেন তাঁর অনুসারী। মর্যাদার দিক থেকেও উভয়জন সম-মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। এ আনুগত্য নিছক আইনের পোশাকি আনুগত্য ছিল না, বরং এ ছিল বাস্তব আনুগত্য বিধান। হযরত মূসা (আ.) হযরত হারুন (আ.)-এর উপর পূর্ণ অধিকার রাখতেন। হযরত হারুন (আ.) কোনোরূপ বিরোধিতার অধিকার রাখতেন না।"

হযরত থানভী (রহ.) আরো লিখেছেন-

"মোটকথা হলো, ইসলামে গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই। ইসলামে শুধুমাত্র ব্যক্তি শাসনের শিক্ষা আছে। আর যেসব আপত্তিকর কারণে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; সেগুলো (বর্তমান) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পাওয়া যাওয়া প্রায় নিশ্চিত; আর একনায়কতন্ত্রে সম্ভাব্য। একনায়কতন্ত্রের একটি দোষ এও বর্ণনা করা হয় যে, একনায়কতন্ত্রে একই ব্যক্তির হাতে সকল শাসনভার ন্যস্ত থাকে; সে যা ইচ্ছে তাই করে। অথচ সে যে কোনো মুহূর্তে ভুলও করতে পারে। তাই একক ব্যক্তির হাতে পূর্ণ শাসনভার ছেড়ে না দেয়াই শ্রেয়। বরং একটি দলের সিদ্ধান্ত মাফিক কার্যাবলি সাধিত হওয়া উচিত। আমার বক্তব্য হলো, যেভাবে একনায়কতন্ত্রের শাসকের সিদ্ধান্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, অনুরূপভাবে এক দলের সিদ্ধান্তেও ভুলের সম্ভাবনা আছে। কেননা এক ব্যক্তির রায় সর্বদা ভুলই হবে, আর দশ জনের রায় সর্বদা সঠিকই হবে; এমনটি অত্যাবশ্যক নয়। বরং অনেক সময় এমনও নজরে পড়ে যে, একজনের দৃষ্টি যেখানে গিয়ে পৌঁছে, হাজার জনের দৃষ্টিও সেখানে গিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয় না। এ সত্য আবিষ্কার জগতে প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে। কেননা, যত রকমের আবিস্কার আছে, তার প্রায় সব ক'টিই কোনো এক ব্যক্তির চিন্তার ফসল। তাদের কেউ একটা বুঝেছে; অন্যজন বুঝেছে অন্যটা। কেউ আবিস্কার করেছে টেলিফোন-টেলিগ্রাম; আবার কেউ আবিষ্কার করেছে ট্রেন। দেখা গেল, আবিষ্কারক সাধারণত একজনই হয়। এবং তার মেধা যেখানে পৌঁছে অযুত-লক্ষ মেধাও সেখানে পৌঁছাতে পারে না। জ্ঞানের রাজ্যেও বিষয়টি এভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। দেখা যায় কোনো একটি জটিল বিষয় কোনো এক ব্যক্তি এমনভাবে বুঝে ফেলেন যার সামনে সকল ব্যাখ্যাতা ও ভাষ্যকারদের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আলোচনা ভুল প্রমাণিত হয়। বোঝা গেল, একদলের মত-সিদ্ধান্তও ভুল হতে পারে। এখন বলুন! যদি কখনো বাদশাহর (একনায়কতন্ত্রের শাসক) মত সঠিক হয়, আর পার্লামেন্টের রায় ভুল হয়; তাহলে কোনটিকে অনুসরণ করবে? গণতন্ত্রে তো অধিকাংশের মতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নিজের রায় মতো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। বরং অধিকাংশের রায়ের চাপে পড়ে ভুল সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য হন। আর একনায়কতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট তার রায় মতে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে অধিকাংশের রায় ভুল হলে সঠিক রায় মতো আমল করার উপায় থাকে না। সকলেই ভুল সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য। আর এটা কত বড় জুলুম। সুতরাং অধিকাংশের রায়ের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত হবে এটা কোনো সাধারণ নিয়ম নয়। বরং নীতি এটা

হওয়া উচিত ছিল যে, সঠিক রায় অনুযায়ী কাজ করা হবে, চাই তা একক ব্যক্তি রায়ই হোক না কেন।"

তিনি আরো বলেছেন-

"তাছাড়া যারা অধিকাংশের রায়ই সিদ্ধান্তের ভিত্তি মনে করেন, তারা তো প্রেসিডেন্টকে সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো অধিকারই দেন না। প্রথম থেকেই তারা এ কথা মনে করেন যে, আমাদের প্রেসিডেন্ট এতটা দুর্বলচিন্তার অধিকারী যে, তার একক রায় কোনো বিষয়েই গ্রহণযোগ্য নয়; তিনি অযোগ্য। যারা নিজেরাই নিজেদের প্রেসিডেন্টকে এমন ধারণা করে; আমরা তাদেরকে আর কী বলব তাদের গণতন্ত্র ধন্য হোক। কেননা এমন প্রেসিডেন্ট একনায়কতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হবার যোগ্য নয়। ইসলামে যেখানে ব্যক্তি শাসনের শিক্ষা আছে, সেখানে পাশাপাশি এই নির্দেশও আছে যে, হে আহলে হাল ওয়া আকদ! হে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান লোক সকল! তোমরা এমন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রনায়ক বাদশাহ নির্বাচন কর; যিনি সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম; এবং সে প্রত্যয় সিদ্ধান্তে বলীয়ান, যদি সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধেও তিনি অভিমত পেশ করেন, তবুও যেন এ সম্ভাবনা থাকে যে, তার অভিমতই সহীহ-বিশুদ্ধ। আর যার অভিমত এতটা শক্তিশালী নয়, তাকে আদৌ রাষ্ট্রপ্রধান বানাবে না। এখন বলুন! যার অভিমত এতটা প্রত্যয়ী যে, সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধেও তার রায় সঠিক হবার সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত; এমন ব্যক্তি কি একক রাষ্ট্র পরিচালক হবার যোগ্য নয়? নিশ্চয় যোগ্য যদি 'আহলে হল ওয়া আকদ' নির্বাচনের ক্ষেত্রে খিয়ানত-বিশ্বাসঘাতকতা না করেন।

মোটকথা, আমরা এ কারণেই ব্যক্তিশাসনের সমর্থন করি যে, আমরা আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানকে সঠিক মতিত্ব ও বিচক্ষণ মনে করি। আর তোমরা অধিকাংশের মতকে এই জন্য সমর্থন কর যে, তোমরা তোমাদের বাদশাহ-প্রেসিডেন্টকে দুর্বলমতিত্ব ও অযোগ্য জ্ঞান কর। ব্যাপারটি যখন এমন, তাহলে এমন ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট বানাবার প্রয়োজনটিই বা কী ছিল? যার পিছনে আবার তালি জুড়তে হয়। বরং প্রথম থেকেই এমন ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কর, যিনি কোনো পশ্চাৎভরসার মুখাপেক্ষী নন; স্বাধীন মতামতের অধিকারী হন; প্রত্যয়ী হন। আর তোমরা যদি তোমাদের প্রেসিডেন্টকে বুদ্ধিমান, সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী ও যোগ্য মনে কর, তাহলে অধিকাংশের মতের উপর সিদ্ধান্তের বুনিয়াদ রাখা; এবং মেধার অধিকারী রাষ্ট্রপ্রধানকে অপূর্ণ মেধাসম্পন্নদের মতের অধীন বানানো জুলুম নয় কি? স্পষ্ট বোকামি নয় কি? অনেকের কাঁধে আবার বোকামির ভূত সওয়ার হয়েছে। ওরা গণতান্ত্রিক শাসনকে ইসলামের মধ্যে ঢুকাবার চেষ্টা করে। এবং দাবি করে, ইসলাম তো গণতন্ত্রেরই শিক্ষা দিয়েছে। তারা প্রমাণস্বরূপ এ আয়াতটি পেশ করে-

وشاورهم فى الامر "এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরমার্শ করুন।"

কিন্তু এটা একান্তই ভুল। এ আয়াতে পরামর্শের কথা বলা হয়েছে। অথচ তারা পরামর্শের দফাসমূহকে পরিহার করছে, তারা ইসলামে পরামর্শের যে স্থান রয়েছে তা বুঝতেই সক্ষম হয়নি। ইসলামে পরামর্শের স্থান হলো এই একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত বারীরাহ (রা.) কে বলেছিলেন, হে বারীরাহ! তুমি তোমার স্বামীকে পুনরায় গ্রহণ করো। ঘটনাটি ছিল এই হযরত বারীরাহ (রা.) প্রথমে একজন কৃতদাসী ছিলেন। আর এ অবস্থাতেই 'মুগীছ' নামক এক সাহাবীর (রা.) সাথে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহ হয়েছিল তাঁর মনিবের নির্দেশে। যখন তিনি দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করলেন, তখন ইসলামের সংবিধান মাফিক বারীরাহ এই অধিকার লাভ করলেন যে, দাসত্বকালীন সংঘটিত বিবাহকে ইচ্ছা করলে বহাল রাখতে পারেন; আবার ইচ্ছা করলে ভেঙেও দিতে পারেন। শরীয়তের পরিভাষায় যাকে বলে 'খিয়ারে ইতক' বা মুক্তিসূত্রের অধিকার। আর এ অধিকার সুবাদেই হযরত বারীরাহ (রা.) পূর্বের বিবাহকে ভেঙে দিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী তাকে দারুণ ভালোবাসতেন। সে বেচারা বিয়োগ ব্যথায় মদীনার অলিতে-গলিতে কেঁদে ফিরতে লাগলেন। তাঁর প্রতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দয়ার সঞ্চার হলো। তখন তিনি হযরত বারীরাহ (রা.) কে বললেন- হে বারীরাহ! তুমি যদি তোমার স্বামীকে পুনরায় গ্রহণ করো। তখন হযরত বারীরাহ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এটাকি আপনার নির্দেশ না পরামর্শ? যদি নির্দেশ হয়, তাহলে তো যেকোনো অবস্থাতেই শিরধার্য। চাই তাতে আমার কষ্টই হোক না কেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন- নির্দেশ নয়; শুধু পরামর্শ। হযরত বারীরাহ (রা.) পরিষ্কার ভাষায় নিবেদন করলেন, যদি পরামর্শ হয় তাহলে আমি তার ঘরে যাব না। লক্ষ্য করুন! এই হলো ইসলামের দৃষ্টিতে

পরামর্শের স্থান। নবী কিংবা খলীফা যদি তাঁর অধীনস্তদের কাউকে কোনো পরামর্শ দেন, তাহলে অধীনস্তদের অধিকার আছে, সেই পরামর্শ মতো আমল না করার। আর এটা শুধু আইনত অধিকার নয় বরং প্রকৃত অধিকার। আর এ জন্যই হযরত বারীরাহ (রা.) যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরামর্শ মতো আমল করেননি, সে জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর প্রতি বিন্দুমাত্র রাগ হননি। এবং এতে না হযরত বারীরাহ (রা.) গোনাহগার হলেন, না তাকে ভর্ৎসনা করা হলো। সুতরাং যখন ইসলামের উম্মত কিংবা অধীনস্তরা তাদের নবী কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানের পরামর্শমাফিক আমল করতে বাধ্য নয়; তাহলে কী করে নবী কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের পরমর্শ মানতে বাধ্য হতে পারে? এটা কী করে সম্ভব, প্রজা যে পরামর্শ দিবে সে মতোই কাজ করতে হবে রাষ্ট্রপ্রধানকে; কখনও এর বিরোধিতা করতে পারবে না।

সুতরাং আয়াত থেকে শুধুমাত্র একথাই প্রমাণিত হয় যে, শাসকগণ অধীনস্তদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করবে। কিন্তু এ কথা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাদের পরামর্শ মতোই কাজ করতে হবে। এবং যদি অধিকাংশের রায় রাষ্ট্রপ্রধানের মতের বিপরীত হয়, তখন রাষ্ট্রপ্রধান অধিকাংশের রায় মতো কাজ করতে বাধ্য? একথা যতক্ষণ প্রমাণিত হবে না, ততক্ষণ এ আয়াত দিয়ে গণতন্ত্রের স্বপক্ষে প্রমাণ দেয়াও ঠিক হবে না। যেখানে ইসলামের দৃষ্টিতে একজন সাধারণ জনগণও রাষ্ট্রপ্রধানের পরামর্শ মানতে বাধ্য নয়, সেখানে কী করে তোমরা স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রজাদের পরমার্শ মানতে বাধ্য করছ? শেষ পর্যন্ত কি এর কোনো দলীল প্রমাণও আছে, না শুধু মুখস্থ দাবি আর দাবি? আমাদের কাছে তো হযরত বারীরাহ (রা.)-এর ঘটনাটি প্রমাণ আছে যে, কারো পরামর্শ মতো আমল করা অত্যাবশ্যকীয় নয়। চাই পরামর্শদাতা নবীই হোক না কেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো, যদি শাসকগণ প্রজা অধীনস্তদের কাছ থেকে পরামর্শ নেন তাহলে তারা সে মতে আমল করতে আদৌ বাধ্য নন। বরং সিদ্ধান্ত নিবে নিজস্ব রায়ের আলোকে চাই তা বিশ্বময় পরামর্শের বিপক্ষেই হোক না কেন। তাই তো আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের পরবর্তী অংশে ইরশাদ করেছেন- فاذاعزمت فتوكل على الله " হে আল্লাহর রাসূল! পরামর্শের পর যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করে সে মতে আমল করুন।"

এখানে عزمت শব্দটি একবচন। বোঝা গেল, সিদ্ধান্ত নেয়ার একক অধিকার আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর। অনুরূপভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিনিধি বা বাদশাহ ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে একক অধিকার লাভ করবে। যদি সিদ্ধান্তের ভার অধিকাংশের মতের উপর হতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা এক বচন শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে বলতেন-

اذاعزم اكثر فتوكلوا على الله

"যখন তোমাদের অধিকাংশ লোক কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তখন তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করো।" দেখা গেল, যে আয়াত দিয়ে তারা গণতন্ত্র প্রমাণ করতে চাচ্ছে, ওই আয়াতেরই শেষাংশ তাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করছে। আসলে গণতন্ত্রবাদীদের অবস্থা হলো- 'একটা ধরতে গিয়ে ছুটে গেল অনেকগুলো।' তারা এক দিকদর্শী। তাছাড়া এ আয়াতে শুধু একথা বলা হয়েছে যে, শাসকগণ অধীনস্তদের থেকে পরামর্শ নিবে। কিন্তু অধীনস্তদের তো আগে বেড়ে পরামর্শ দেয়ার অধিকার দেয়া হয়নি। এমন তো বলা হয়নি যে, শাসক পরামর্শ কামনা করুন আর নাই করুন, তাকে পরামর্শ শুনতে বাধ্য কর। শরীয়তের কোথাও তো "তোমরা শাসকদেরকে পরামর্শ দাও; এটা তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার" বলা হয়নি। যখন ইসলাম অধীনস্ত প্রজা সম্প্রদায়কে নিজ ইচ্ছেমতো পরামর্শ দেয়ার অনুমতি দেয়নি, তখন আবার ইসলামে গণতন্ত্রের অবকাশটা কোথায়? কেননা, গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের তলব ছাড়াই পার্লামেন্টের রায় পেশ করার অধিকার আছে। (তাকলীলুল ইখতিলাত মা'আল আনাম পৃ. ৪৮, আশরাফুল জাওয়াব পৃ.৩০১-৩১০, মা'আরিফে হাকীমুল উম্মাত পৃ .৬২০-৬৩০)

রাষ্ট্রপরিচালনা একটি দায়িত্ব; অধিকার নয়:

ইসলামের ব্যক্তিশাসন ও অনৈসলামিক একনায়কতন্ত্রের মধ্যে আরেকটি মৌলিক পার্থক্য হলো, অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থায় রাজতন্ত্র বা একনায়তকতন্ত্রকে একটি অধিকার (Previlege) বা একটি সুযোগ (Advantage) ধারণা করা হয়। এজন্যই সেখানেই প্রশ্ন ওঠে এ অধিকার কাকে মিলবে বা কাকে মিলবে না। আর এজন্যই মানুষ তা

অর্জন করার ক্ষেত্রে জোর চেষ্টা তদবীর চালায়, পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে এটিএকটি 'আমানত' বা 'দায়িত্ব'। শাসকদের ভোগ-বিলাস অর্জনের মাধ্যম নয়। বরং বলা যেতে পারে, শাসনভার মানে দুনিয়া ও আখিরাতের একটি বিরাট বোঝা নিজের কাঁধে বহন করা, সুতরাং এটা নিজে চেষ্টা করে অর্জন করার বিষয় নয়। বরং যথাসম্ভব এ থেকে দূরে থাকা শ্রেয়। যে ব্যক্তি শাসনক্ষমতা প্রার্থনা করে, ইসলাম তাকে শাসন পরিচালনার অযোগ্য ঘোষণা করেছে। ইসলামী রাজনীতির মধ্যে প্রার্থী হওয়ার কোনো স্থান নেই।

সরকারের কর্তব্য :

সুতরাং যেকোনো ব্যক্তিকে এ দায়িত্ব দেয়া হবে, তাকে এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই দায়িত্ব আদায় করতে হবে যে, প্রকৃত পক্ষে হুকুমত আসল লক্ষ্যবস্তু নয় যে সর্বাবস্থায় তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। বরং মূল লক্ষ্যবস্তু হলো আল্লাহর রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি। কাজেই যখনই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং হুকুমতের মধ্যে টককর বাঁধবে তখন সে সাথে সাথে নিঃশঙ্কচিত্তে, সহাস্যবদনে আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে ক্ষমতা জলাঞ্জলি দিবে। এ প্রসঙ্গে এক আলোচনায় হযরত থানভী (রহ.) বলেন-

স্মরণ রেখো! রাষ্ট্রপরিচালনা মানবজীবনের মূল লক্ষ্য নয়। বরং মু'মিনের অভীষ্ট লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ যদি নারাজ থাকেন, তাহলে আমরা ক্ষমতার মসনদে গেলে ফিরাউন হব। ধ্বংস হোক এমন ক্ষমতা যার কারণে আমাদেরকে ফিরাউনের কাতারে দাঁড়াতে হয়। যদি রাষ্ট্র পরিচালনাই অভীষ্ট লক্ষ্য হতো, তাহলে ফিরাউন, হামান, নমরুদ, শাদ্দাদ আল্লাহর খুব প্রিয়বান্দা হতো। অথচ তারা অভিসম্পাতিত মালউন। বোঝা যায়, এমন শাসনক্ষমতাই কাম্য যার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টিও আছে। আর যে শাসনক্ষমতায় আল্লাহর সন্তুষ্টি নেই; সেটা জীবনের জন্য ধ্বংস। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে আমরা পায়খানা উঠাতেও রাজি আছি। আর এই অবস্থাতে আমরা বাদশাহ। তোমরা কি মনে কর, হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) পাগল ছিলেন? তিনি তো রাজত্ব ছেড়ে দেননি যে, এটা উদ্দেশ্য হাসিলের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে?বোঝা গেল, আসল উদ্দেশ্য বাদশাহী করা নয়, উদ্দেশ্য অন্য কিছু। যখন ওই উদ্দেশ্যে পৌঁছতে বাদশাহী বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তখন বাদশাহী বর্জন করাই বাদশাহী। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) সব বিষয়ে ইমাম ছিলেন। তিনি নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী ও মুহাদ্দিস, ফিকাহ শাস্ত্রে ফিকাহবিদ এবং সুফীগণের তো ইমাম ছিলেনই। তাই তাকে কেউ পাগল বলতে পারবে কি? তবুও যদি কেউ তাকে পাগল বলে মনে করে তাহলে সে নিজেই পাগল। এখন দেখ, হযরত ইবরাহীম (রহ.) কী কাণ্ড করেছেন? আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে যখন বাদশাহীকে অন্তরায় দেখলেন, তখন বাদশাহীর কপালে লাথি মেরে ভিন্ন পথ ধরলেন। হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর জন্য বাদশাহী ক্ষতিকর ছিল না, তাই তাদেরকে খিলাফতের আসনে সমাসীন হতে অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর হযরত আবু যর (রা.)-এর জন্য ক্ষতিকর ছিল; তাই তার জন্য নির্দেশ ছিল-

"দুই ব্যক্তির মাঝে ফায়সালাও করতে পারবে না।"

এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়, বাদশাহী অভীষ্ট লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য বিষয় হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি। সুতরাং যদি বাদশাহী আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে বাদ সাধে; তখন বাদশাহী থেকে বিরত থাকতে হবে। (তাকলীলুল ইখতিলাত মা'আল আনাম পৃ. ৬-৬২, আশরাফুল জাওয়াব পৃ.৪৫৫-৪৫৬)

সুতরাং ইসলামী সরকারের দায়িত্ব হলো, তারা শাসনক্ষমতাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায় বানাবার লক্ষ্যে ইসলামী বিধান মতো আমল করবে এবং তা বাস্তবায়িত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। অন্যথায় এ সরকার হবে ব্যর্থ। এবংবিধ ক্ষমতায় জড়িয়ে থাকা তার জন্য হবে হারাম-অবৈধ। তাই সরকারের কর্তব্য হলো, অত্যন্ত সন্তর্পণে নিজেদের প্রতিটি কর্মসূচিকে যাচাই-বাছাই করা। এবং শরীয়তের আনুগত্যের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অনীহা-অলসতা প্রদর্শন না করা।

এ মর্মে হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.) বলেন-

"আমার মতে যত সব রাজত্ব ধ্বংস হয়েছে, ছোটখাটো বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব না দেয়ার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। কেননা বিন্দু বিন্দু অলসতায় গড়ে উঠে অলসতা আর অসর্তকতার পাহাড়। যা পরিশেষে সকলেরই চোখ টানে, নজরে পড়ে। কারণ হয় বিশাল ধ্বংসের। তাছাড়া ছোটখাটো বিষয়ের প্রতি নিয়মিত অসর্তকতা করতে করতে এক সময় অসর্তকতা স্বভাবে পরিণত হয়। যা সরাসরি রাজত্বের ধ্বংস ডেকে আনে।"(ইসলাহুল মুসলিমীন পৃ. ৫৩৭, বহাওয়ালায়ে

আল ইফাযাত পৃ.৭, মালফুয নং ২৫৯)

যেভাবে একজন মুসলমান শাসকের দায়িত্ব সর্বদা ন্যায়ের পথে অটল থাকা, ঠিক সেভাবে এটাও তার দায়িত্ব যে, তার অধীনস্ত কাউকে অবিচার করতে না দেয়া, এ সম্পর্কে হযরত থানভী (রহ.) বলেন-

"শুধুমাত্র শাসক ব্যক্তিগত পর্যায়ে সতর্ক থাকলেই মুক্তি পাবে না। বরং শাসনব্যবস্থার পুরো দায়িত্বও তার কাঁধেই। তাই তাকে তার অধীনস্ত লোকদেরকেও জুলুম-অবিচার করা থেকে বিরত রাখতে হবে। পদ্ধতি এমন হতে পারে শাসক ঘোষণা দিয়ে দিবেন যে, আমাদের এখানে ঘুষ অবৈধ। তাই আমার আমলাদের মধ্যে কেউ যদি ঘুষ চায়, তাহলে তাকে ঘুষ দিবেন না। বরং আমাদেরকে এ বিষয়ে অবগত করবে। সতর্ক সংকেতের পরও যে ব্যক্তি ঘুষ নিবে তার কাছ থেকে সে পয়সা আদায় করবে এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবে। অধিকন্তু শাসকদের সরাসরি প্রজাদের সাথে সম্পর্ক রাখা উচিত। মধ্যখানে কোনো মাধ্যম ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা মধ্যস্থতাকারীরা দারুণ যাতনা বয়ে আনে। যদি বল হুজুর! এত দারুণ মুশকিল। তাহলে বলব, জনাব! রাজত্ব করাও সহজ নয়; এটা ভাতের লুকমা নয়; বরং সর্বদা জাহান্নামের কিনারায় তার অবস্থান।" (আনফাসে ঈসা পৃ.২২৪-২২৫,খ.-১, অধ্যায়-৪)

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় শাসক ও উলামা শ্রেণীর মাঝে কর্মবণ্টন কিভাবে হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.) বলেন-

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন শানে নবুওয়াত ও শানে হুকুমতের সমন্বিত ধারক। তাঁর পর খোলাফায়ে রাশেদীনও ছিলেন উভয়গুণে সমভাবে উন্নীত। কিন্তু এখন এই দুই ধারা ভিন্ন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শানে নবুওয়াতের বিকাশ ক্ষেত্র আলিমগণ আর শানে হুকুমতের বিকাশভূমি মুসলমান প্রশাসকগণ। এখন যদি প্রশাসকগণ আলিমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি গুণধারা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হয়। আর যদি আলিমগণ প্রশাসকদের বিরোধিতা করেন, তাহলে এ ক্ষেত্রেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অপর বৈশিষ্ট্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হয়। তাই বর্তমানকালে এই উভয় গুণের সমন্বয় বিধানের জন্য আমি শাসকদের সমীপে এই আরজ করব যে, তারা যেন কখনও আলিমদের কাছে ফাতাওয়া না জেনে কোনো নির্দেশ জারি না করেন। আর আলিমদের খিদমতে বলব, তারা যেন এরূপ সরকারি ঘোষণার উপর আমল করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বৈশিষ্ট্য দু'টির যদি এভাবে সমন্বয় ঘটে, তবে মুসলমানদের সফলতার পথ বেরিয়ে আসবে। এবং তাদের ডুবন্তপ্রায় তরী খুঁজে পাবে কিনারা। অন্যথায় 'আল্লাহই হাফিজ'। (ইসলাহুল মুসলিমীন পৃ.৫৩৬)

বৈধ সীমায় থেকে বুদ্ধিজীবিদের এবং অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নেয়াও শাসকদের কর্তব্য। পরামর্শের পর যখন কোনো দিক প্রাধান্য পায় এবং শাসক আল্লাহর উপর ভরসা করে সে মাফিক সিদ্ধান্তও দিয়ে দেন; তখন সকলকেই তা মেনে নেয়া ওয়াজিব অবশ্য কর্তব্য, চাই সে ফায়সালা নিজেদের মতের বিরোধিই হোক না কেন। এ সম্পর্কে হযরত থানভী (রহ.) বলেন-

"রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হলো, সর্বদা জ্ঞানীদের পরামর্শ নেয়া। কেননা এসব লোকের মতামত না জানলে অনেক সময় অনেক বিষয় প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। তাই পরামর্শ কাম্য। কিন্তু নবআবিষ্কৃত এ গণতন্ত্র একটি প্রতারণামাত্র। বিশেষভাবে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মুসলমান এবং কাফির সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয় সেটা অমুসলিম রাষ্ট্রই হবে। এ রাষ্ট্রকে কখনও ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাবে না।"

এক ব্যক্তি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলেছিল, রাষ্ট্রপ্রধান যখন পরামর্শ চাবেন তখন যদি পরামর্শদাতা আহলে শুরার মধ্যেই সে বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে এ সম্পর্কে কী বিধান রয়েছে? রাষ্ট্রপ্রধানের মতের বিরোধিতা তো আর নিন্দিত নয়। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন-

"বিচক্ষণতা, মঙ্গলকামিতা, দীনদারী আর কল্যাণের স্বার্থে মতবিরোধ নিন্দিত নয় কখনো, তবে এরও একটা সীমারেখা আছে। অর্থাৎ পরামর্শের পর্যায়ে এই বিরোধিতা বৈধ আছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত হবার পর বিরোধিতা বা বিপরীত আমল করা নিন্দনীয়। বরং তখন আনুগত্যই ওয়াজিব।"(আল ইফাযাতুল ইয়াউমিয়্যাহ পৃ. ১১১, খ.৩, মালফুয নং-২৫২)

এটা মূলতঃ "বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো; যখন সিদ্ধান্ত করে ফেলবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করবে।" আয়াতের-ই ব্যাখ্যা।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

স্মরণ
আওলিয়া জীবন

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)

মাওলানা আবদুল মজিদ

(জুলাই ২০১৩ সংখ্যার পর)

উপরোক্ত আলোচনা কোনো হানাফির আবেগজড়িত কলমের উচ্ছ্বাস নয়, বরং বহু আলোচিত এক শাফী ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. তার কিতাব "تبييض الصحيفة فى مناقب الإمام أبى حنيفة" তেই এই ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো ইলমুশ শরীয়তে তিনিই প্রথম বিষয়ভিত্তিক পুস্তক সংকলন করেন। ইমাম মালেক (রহ.) তার কিতাব 'মুয়াত্তা' লেখার সময় তার দেখানো পথেই চলেছেন এবং এ বিষয়ে কেউ ইমাম আবু হানীফাকে অতিক্রম করতে পারেনি। ইমাম মালেক (রহ.) তার গ্রন্থ রচনায় ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর কিতাব থেকে ফায়দা নিতেন এ কথা ইতিহাসের একটি অতি পরিচিত কথা। (ফাযায়েলে আবী হানীফা ওয়া আখবারুহু ওয়া মানাকিবুহু, পৃঃ ২৩৫) সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হাদীস সংকলনের এক নতুন অধ্যায়ের আবিষ্কারক হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন। প্রমাণসরূপ জামে' সুফিয়ান সাওরী (جامع سفيان الثورى) সম্পূর্ণ كتاب الآثار এর অনুসরণ করে উম্মতের হাতে আসল। ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.) (মৃঃ ১৬১) এর এই কিতাব সে সময়ে ব্যাপক গ্রহণযোগ্য ছিল। ইমাম বুখারী রহ. হাদীসান্বেষণের শুরুতেই তা মুখস্ত করে ফেলেন। (তারীখে বাগদাদ, ২ঃ ১১) এই কিতাব রচনার সময় তিনি ইমাম আবু হানীফার সাহায্য নিয়েছিলেন। (ইমাম ইবনে মাজাহ. পৃঃ ১৮৪-৮৫) এ কারণেই যখন ইমাম আবু হানীফার প্রসিদ্ধ শিষ্য ইমাম যুফার (রহ.)-এর হাতে গ্রন্থটি আসে, তখন তিনি দেখা মাত্রই বলে ফেলেন, هذا كلامنا ينسب إلى غيرنا অর্থাৎ এটা আমাদের কথা আজ অন্যের নামে চলছে। (মানাকিবুল ইমাম আজম, কারদারী, ২ ঃ ১৮৩)

হাদীস সংকলনের এই নতুন ধারার উদ্ভাবন থেকে উম্মত যত বেশি উপকৃত হয়েছে, অন্য কোনো ধারা থেকে তত বেশি উপকৃত হয়নি। তেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের মতামত ফিকহের উপর যথেষ্ট প্রভাব রাখে, তাই ইমাম আবু হানীফা (রহ). اختلاف الصحابة কিতাব লিখে এই বিষয়টি উম্মতকে বুঝিয়েছেন। এটা তারই অবদান। (মাআ'রিফুস সুনান, ২ ঃ ৩৮৩)

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর আরেকটি অবদান হচ্ছে ফিকাহ ও হাদীসের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করা। জেনে রাখা দরকার যে, হাদীস শাস্ত্রকে যদি আমরা দুধ মনে করি তাহলে ফেকাহ হলো তার মাখন। এই ফিকাহর মাধ্যমে ইস্তিম্বাতকৃত মাসায়িল উম্মতের সর্বাধিক দ্বীনি প্রয়োজন পূর্ণ করার জিম্মাদার। উলামায়ে সলফের মধ্যে প্রতি যুগেই এর ব্যাপক চর্চা ছিল। দেখুন, হাকেম আবু আবদুল্লাহ নিসাপুরী (রহ.) তার কিতাব معرفة علوم الحديث এর মধ্যে বিশতম পাঠে বলেন, উলূমে হাদীসের অন্যতম একটি ইলম হলো ফিকহুল হাদীস। এটাই ইলমের নির্যাস। আর এর উপরই দাঁড়িয়ে আছে ইসলামী শরীয়ত। আর ইসলামে কিয়াস, রায়, ইস্তিম্বাত, যাদাল ও নযরের অধিকারী উলামায়ে কেরাম প্রতি যুগেই প্রতি শহরেই নিজ খ্যাতি নিয়ে বিদ্যমান ছিলেন। আমরা এখানে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে ফিকহুল হাদীস নিয়ে আলোচনা করব। যাতে হাদীস শাস্ত্রের মধ্যে ডুবে থাকা মানুষগুলো ফিকহকে ভুলে না যায় এবং উপেক্ষা না করে। কেননা ফিকাহ হাদীসেরই একটি শাখা। (পৃঃ ৬৩)

ইমাম নিসাপুরীর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে চারটি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এসেছে।

১. ইসলামী শরীয়তের ভিত্তি যে ফেকাহর উপর, তা হাদীসেরই নির্যাস।

২. হাদীস থেকে ফিকহী মাসায়েল ইস্তিম্বাতকারীগণ প্রতি যুগে ও শহরে ব্যাপকহারে বিদ্যমান ছিলেন।

৩. মুসতালাহুল হাদীস, ইলমুল জরহি ওয়াত্ তা'দীলের মতো ফিকাহ হাদীসেরই একটি শাখা, বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

৪. কোনো হাদীস চর্চাকারীর এ বিষয়ে উদাসীন থাকার সুযোগ নেই।

ফিকাহ এর গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে এর চেয়েও পরিষ্কার কথা বলেছেন ইমাম আবু সুলাইমান খাত্তাবী (মৃঃ ৩৮৮) । তিনি হাদীস ও ফিকাহ চর্চাকারীদের সম্পর্কে বলেন ঃ তারা কেউ গন্তব্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে অন্যকে বাদ দিয়ে স্বনির্ভর নয়। কেননা হাদীস কোনো ভবনের ভিত্তি আর ফিকাহ তার উপর নির্মিত প্রাসাদের ন্যায়। ফলে ফিকাহ হাদীসেরই একটি শাখা। ভিত্তি ছাড়া প্রাসাদ ধ্বংস হবেই আর প্রাসাদ ছাড়া ভিত্তি বিরান মরুভূমির ন্যায়। (মা'আলিমুস সুনান, ১ ঃ ৩)

ফিকহ ও ফুকাহাদের ওসিলায় অনেক মুহাদ্দিস গোমরাহী থেকে বেঁচে গিয়েছেন। ইমাম ইবনে ওহাব (রহ.)-এর বক্তব্য শুনুন ঃ হাদীস ওয়ালা যদি কোনো ফিকহের ইমামকে আঁকড়ে না ধরেন, তাহলে গোমরাহ হয়ে যাবে। ইমাম মালিক ও লাইস যদি না থাকত তাহলে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম। এবার শুনুন আবু সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার কথা ঃ হাদীস ভ্রষ্টতার একটি জায়গা তবে ফুকাহাদের জন্য নয়। (আসারুল হাদীসিশ্ শরীফ, শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামাহ, পৃঃ ৮৩) তারপর শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামাহ বলেন, ইবনে উয়াইনা বলতে চেয়েছেন : কোনো মুহাদ্দিস যদি ফিকাহ না জানে তাহলে তিনি অনেক সময় হাদীসকে তার

বাহ্যিক কোন অর্থে ব্যবহার করে। অথচ অন্য হাদীসের দিকে তাকালে তার ভিন্নার্থ দাঁড়ায়। অথবা এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ না করার পক্ষে অন্য একটি হাদীস বিদ্যমান যা মুহাদ্দিসের কাছে স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে একটি দলিল এই হাদীসকে বর্জন করতে বাধ্য করছে যা এ ব্যক্তির জানা নেই। এ সবই ফকীহের কাজ, তিনি ছাড়া অন্যদের জন্য এটা মোটেও সম্ভব নয়। (প্রাগুক্ত)

ইতিহাসে কেবল হাদীস মুখস্ত করে ফিকাহকে বাদ দিয়ে দ্বীনের উপর চলার চেষ্টাকারীদের থেকে এমন এমন পদস্খলন ও ভুল প্রকাশ পেয়েছে, যা হাস্যকর এবং রীতিমতো বিস্ময়কর। উদাহরণস্বরূপ এখানে তার দু'টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

এক. মাওলানা ইউসুফ বানুরী (রহ.) তার জগদ্বিখ্যাত কিতাব ''মা'আরিফুস সুনান''এর ১ম খণ্ডের ২৪০ পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলিম দাউদ যাহেরীর একটি মত ইমাম নববীর সূত্রে বর্ণনা করেছেনে। তারপর তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যেন স্থির পানির মধ্যে পেশাব করে পরে আবার সেখান থেকে অযু না করে। হাদীসটি হাসান সহীহ। (সুনানে তিরমিযী, পৃঃ ২১) দাউদ যাহেরী বলেন, এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। পায়খানা করতে তো আর নিষেধ করেননি। কত বড় হাস্যকর কথা? আর এটাকেই তারা হাদীসের উপর আমল বলে প্রচার করছে।

দুই. জনৈক মুহাদ্দিসকে দেখা গেছে, তিনি ইস্তেঞ্জা করা মাত্রই অযু ছাড়াই বিতর নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, এটা কোন ধরনের আমল? তিনি জবাব দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন من استجمر فليوتر (আস্-সুন্নাহ ওয়া-মাকানাতুহা, ড. মোস্তাফা সিবায়ী, পৃঃ ৪৪৩)। উক্ত মুহাদ্দিস হাদীসের অর্থ করেছেন, যে ইস্তেঞ্জা করবে, সে যেন বিতর নামায পড়ে। অথচ হাদীসটির প্রকৃত অর্থ হলো, যে ইস্তেঞ্জা করে সে যেন বেজোড় ঢিলা ব্যবহার করে। উল্লেখ্য, বিতর (وتر) শব্দের অর্থ : বেজোড়। আর তিনি ধরে নিয়েছেন এর উদ্দেশ্য হলো বিতর নামায। ফিকহী সমঝ ছাড়া এমন হাস্যকর অর্থ উদ্ভাবন করে হাদীস মতো আমল করার আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। এ কারণেই ইমাম ইবনে উয়াইনাহ (মৃঃ ১৯৮) বলেছেন, হাদীস গোমরাহ হওয়ার জায়গা কেবল ফুকাহাদের জন্য নয়।

তাই তো দেখা যায় ইতিহাসের প্রতি যুগেই ফিকহ ও ফকীহদের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল। ইমাম ইবনে আবদুল বার মালেকী (রহ.) তার গ্রন্থ "ইন্তিকা"তে নিজস্ব সূত্রে আলী ইবনে জা'দ থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা একদা যুহাইর ইবনে মু'আবিয়ার নিকট বসা ছিলাম। তখন একজন লোক আসল। যুহাইর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছো? সে বলল, আবু হানীফার কাছ থেকে। তখন যুহাইর (রহ.) বললেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর কাছে একদিনের জন্য যাওয়া, আমার কাছে এক মাসের জন্য আসা থেকে উত্তম। (পৃঃ ১৩৪)

ইমাম সুয়ূতী (রহ.) তার ''আল-হাবী" গ্রন্থে বর্ণনা করেন, উলামায়ে সালফ বলতেন, ফিকহ ছাড়া মুহাদ্দিস, ডাক্তারী না জানা ঔষধ বিক্রেতার মতো। ঔষধ তার দোকানে আছে, কিন্তু কোন কাজের তা তার জানা নেই। আর ফকীহ হাদীস ছাড়া ওই ডাক্তারের ন্যায়, যার ডাক্তারি জানা আছে, কিন্তু তার কাছে ঔষধ নেই। (২ ঃ ৩৯৮)

এই ফিকাহই ছিল ইমাম আবু হানীফা (রহ.)এর শাস্ত্র। এই বিষয়ে তিনি প্রবাদপুরুষ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ ফিকাহ শাস্ত্র তার হাতে পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়েছে। ইমাম হাম্মাদ (রহ.) (মৃঃ ১২০)-এর মৃত্যুর পর মানুষ ফিকাহর জগতের নেতৃত্বের শীর্ষ চূড়ায় তাকেই স্থান করে দিয়েছে। ফলে তিনি হাদীস ও ফিকাহর সকল ধরনের পিপাসুদের মোহনায় পরিণত হয়েছেন। যার ফলে একদিকে যেমন ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (মৃঃ ১৮১), মাক্কী ইবনে ইবরাহীমের মতো হাদীসের জগতের দিকপালেরা তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও যুফারের ন্যায় ফকীহরাও তার নিকট এসে জড়ো হয়েছেন। এদের তালিকা তো অনেক দীর্ঘ।

হাদীসকে ফিকাহমুখী আর ফিকাহকে হাদীসমুখী করার এক নতুন স্রোত চালুর লক্ষ্যে তিনি ৪০ সদস্যের একটি একাডেমী গঠন করেন। হাদীস শাস্ত্রের নির্যাস হিসেবে যে ফিকাহ খায়রুল কুরূনে সমাদৃত হয়েছিল, তার মধ্যে ইমামে আ'জমের নক্ষত্রসম সুউচ্চ মর্যাদা ও অবস্থান এবং তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর এ উক্তি থেকেই প্রতীয়মান হয়, তিনি বলেন : সমস্ত মানুষ ফিকাহর জগতে ইমাম আবু হানীফার উপর নির্ভরশীল। (কাওয়ায়েদ ফি উলূমিল হাদীস, পৃঃ ৩১৩)

ইমাম ইসফারাইনী (রহ.) নিজ সূত্রে মা'মার বিন রাশেদ (মৃঃ ১৫৪ হিঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আমি হাসান বসরীর (মৃঃ ১১০) পর তার (ইমাম আবু হানীফা) থেকে ভালো কোনো ফিকাহ চর্চাকারী পাইনি।

আবু হাইয়ান আত তাওহীদি বলেন, রাষ্ট্র বিজ্ঞানে বাদশাহরা ওমর (রা.) (মৃঃ ২৩ হিঃ)-এর শিষ্য আর ফুকাহাগণ ফিকায় আবু হানীফার উপর নির্ভরশীল। (প্রাগুক্তঃ ৩১৪)

পূর্বের আলোচনা দ্বারা আমরা তিনটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি :

১. ফিকাহ চর্চার জগতে পরবর্তীরা যে যেখানে যত অবদান রেখেছেন, তার সবই ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ফুয়ূজ।

২. 'ফিকাহ ও হাদীস একে অপরের পরিপূরক' এ দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভাবক ইমাম আবু হানীফা।

৩. ফিকাহ ছাড়া হাদীস চর্চা অনেক গোমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

ঝরে গেল আজিজী কাননের সর্বশেষ পুষ্পটিও
আল্লামা শাহ মোহাম্মদ ইসহাক (সদর সাহেব) রহ.

হাফেজ মাওলানা রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম যৌবনের গান প্রবন্ধে যুবকের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, প্রায় একশ বছর বয়স্ক আল্লামা শাহ ইসহাক সদর সাহেব (রহ.) ছিলেন তারই নিখুঁত রূপ। তার ভেতরে ঢাকা ছিল যৌবনের তেজস্বী সূর্য। জীবন সায়াহ্নে ও বার্ধক্য তার মানসকে স্পর্শ করেনি; আঁচড় লাগাতে পারেনি তাঁর মন-মননে। কাজের গতিশীলতা, চিন্তার প্রখরতা ও চিত্তের উত্তাপে টগবগে যুবাকেও তিনি হার মানাতেন। গত ২৪ জুলাই ২০১৩, ১৪ রমাজান ১৪৩৪ হিঃ তিনি মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদেরকে চির এতিম করে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) এ মুহূর্তে স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর ঐতিহাসিক উক্তি "একজন আলেমের মৃত্যু ইসলামের জন্য ছিদ্র স্বরূপ, যার পূর্ণতা কিয়ামত পর্যন্ত অন্য কোনো বস্তু দ্বারা সাধিত হয় না।" মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তিনি স্ত্রী, ৯ পুত্র, ৬ মেয়ে, নাতি-নাতনি ও দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ছাত্র ও ভক্ত মুরিদান রেখে যান।

দক্ষিণ চট্টলার প্রখ্যাত ও বর্ষীয়ান আলেমে দ্বীন, টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া দারুস্সুন্নাহর শায়খুল হাদীস, পীরে কামেল আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক সদর সাহেবের মৃত্যু নিছক এক ব্যক্তির মৃত্যু নয়, ইসলামী জ্ঞানের এক বিশ্বকোষের যেন দুঃখজনক ইতি। উর্দু, ফার্সি ও আরবী সাহিত্যে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তাঁর ইন্তিকালের মাধ্যমে উপমহাদেশের অন্যতম দ্বীনি বিদ্যাপীঠ আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কুতবে জমান আল্লামা মুফতী আজিজুল হক (রহ.)-এর খলীফাদের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

জন্ম ও বংশ পরিচয় :

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (রহ.) ১৯১৬ সালে টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের পূর্ব সিকদারপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মাওলানা আবদুর রউফ, মাতার নাম ছুরফুন্নেছা। তাঁর আরো ২ ভাই ও ৪ বোন ছিলেন।

লেখাপড়ার হাতেখড়ি :

লেখাপড়ার হাতেখড়ি নিজ গ্রামেই। ১৯২১ সালে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি প্রাথমিক লেখাপড়া শুরু করেন তাঁর পারিবারিক মাদরাসায়। ১৩৪৭ হিজরী মোতাবেক ১৯২৭ ইংরেজিতে হ্নীলা দারুস্সুন্নাহ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে ভর্তি হন। পরে বাঁশখালী পুইছড়ী সরকারি মাদরাসায় ভর্তি হন। তখন সরকারি নেসাব ও কওমী নেসাব প্রায় এক ও অভিন্ন ছিল। সেখান থেকে জমাতে উলা (ফাজিল) পাস করেন।

দারুল উলুম দেওবন্দে :

দারুল উলুম দেওবন্দ একটি আন্দোলন। ভারতের উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ থানায় প্রতিষ্ঠিত মহাকালের সাক্ষী মুসলিম তাহজীব-তামাদ্দুনের রক্ষাকবচ হিসেবে শতবর্ষের উপরে পাক-ভারত বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের ধর্মীয় মুরব্বির দায়িত্ব পালনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যে প্রতিষ্ঠান, তার নাম দারুল উলুম দেওবন্দ। এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের আকাবিরদের পদচারণায় মুখরিত ছিল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক সদর সাহেব (রহ.) তখন বাঁশখালীর পুইছড়ী সরকারি মাদরাসায় অধ্যয়নরত ছিলেন। ইতিমধ্যেই তাঁর সাথে পরিচয় হয় কুতবে জামান আল্লামা মুফতী আজিজুল হক (রহ.)-এর সাথে। আস্তে আস্তে হযরতের সাথে তাঁর পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পৌঁছে। মুফতী সাহেব (রহ.) তার মধ্যে যোগ্যতা ও প্রতিভার ঝলক দেখতে পেয়ে তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, তুমি দারুল উলুম দেওবন্দে চলে যাও। আপন শায়খের অনুপ্রেরণায় তিনি পাড়ি জমান আকাবিরদের স্মৃতিবিজড়িত দারুল উলুম দেওবন্দে। দেওবন্দে তিনি দাওরায়ে হাদীসের (সমাপনী বর্ষে) হাদীসের বিখ্যাত বিশুদ্ধ ছয় গ্রন্থ ও তাফসীরের জ্ঞান অর্জন করেন। দেওবন্দে তিনি ব্রিটিশ হটাও আন্দোলনের অগ্রসেনানী, আওলাদে রাসূল (সঃ) সাইয়্যিদ আল্লামা

হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর সান্নিধ্যে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। দেওবন্দে তিনি অন্যান্য যেসব হীরকতুল্য শিক্ষকদের কাছে পড়েছেন, শায়খুল আদব মাওলানা ই'জাজ আলী, মাওলানা ইবরাহীম বলিয়াভী (রহ.)। দেওবন্দে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান, আল্লামা শাহ আহমদ শফী, মাওলানা নুরুল ইসলাম জদীদ (রহ.) প্রমুখ।

আধ্যাত্মিক সাধনা :

ইলমে জাহেরীর সাথে সাথে ইলমে বাতেনী, তথা তাসাউফ-সুলুকের রাজপথেও ছিল তাঁর সরব পদচারণা। কুতবে যমান আল্লামা মুফতী আজিজুল হক (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে তাসাউফের রাজপথে শুরু হয় তার কঠোর সাধনা-সংগ্রাম। অবঃশেষে কঠোর মেহনত মোজাহাদার মাধ্যমে তাসাউফের তিরে তরী ভেড়াতে সক্ষম হন তিনি। খেলাফত লাভে ধন্য হন কুতবে যমান আল্লামা মুফতী আজিজুল হক (রহ.)-এর কাছ থেকে। তাসাউফের ময়দানে তাঁর সহপাঠী ছিল, আল্লামা সোলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.), আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী, আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম, (রহ.) আল্লামা হোসাইন আহমদ (রহ.) (প্রকাশ বড় হুজুর), আল্লামা বজলুস সোবহান (রহ.) প্রমুখ।

তাঁর খলীফাবৃন্দ :

তিনি ছিলেন নিভৃতচারী এক মহান জ্ঞানসাধক। তাঁর হাজার হাজার ভক্ত মুরিদ দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তাদের সবার তালিকা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। আংশিকভাবে তাদের কয়েকজনের নাম উল্লখ করা হলো...

১. হযরত আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী। ২. মাওলানা আখতর কমাল (সুফি)। ৩. মাওলানা জোনাইদ (দওম সাহেব) ৪. মাওলানা রফিক উল্লাহ। ৫. হাফেজ ইলিয়াছ। ৬. মাওলনা আমান উল্লাহ। ৭. মুফতী বুরহান উদ্দিন। ৮. মুফতী ইউনুছ। ৯. মাওলানা রিদুয়ান (ঝাপুয়া)। ১০. মাওলানা আবদুল কদিরসহ আরও অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম।

জামেয়া পটিয়ায় :

লেখাপড়া শেষ করে দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শিক্ষকতা দিয়েই প্রবেশ করেন কর্মজীবনে। তাঁর প্রথম কর্মস্থল উপমহাদেশের অন্যতম বিদ্যাপীঠ আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া। কুতবে যমান আল্লামা আজিজুল হক (রহ.)-এর আহবানে ১৯৪৭ সালে যোগদান করেন জামিয়া পটিয়ায়। সেখানে তিনি প্রায় দশ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শিক্ষা দান করেন। পটিয়া মাদরাসায় তার ছাত্রদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাঁর সান্নিধ্যে অসংখ্য মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুফতি আদর্শবান লেখক, বক্তা ও রাজনীতিবিদ তৈরি হয়েছেন।

রচনাবলি :

স্বীয় শায়খ মুফতী আজিজুল হক (রহ.)-এর আদর্শ ও কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে রচনা করেছেন ২ খণ্ডের অনবদ্য সংকলন কামালাতে আজীজ। এ ছাড়াও তাঁর কয়েকটি পুস্তিকার উল্লেখ পাওয়া যায়।

জামেয়া দারুস্‌সুন্নাহ হীলায় যোগদান

১৯৫৭ সালে তিনি পটিয়া মাদরাসা থেকে চলে আসেন এবং নিজ পৈত্রিক নিবাস হীলা দারুস্‌সুন্নাহ মাদরাসায় সদরে মুহতামিম ও প্রধান মুফতী হিসেবে যোগদান করেন। তিনি এ মাদরাসার শায়খুল হাদীসের পদও অলংকৃত করেন। তিনি ইন্তিকালের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অত্র জামেয়ায় প্রায় ৫৬ বছর শায়খুল হাদীস, সদরে মোহতামিম ও প্রধান মুফতির দায়িত্ব পালন করেন। হীলা মাদরাসার কথা আসলেই অবধারিতভাবে চলে আসত সদর সাহেব (রহ.)-এর নাম। সদর সাহেব (রহ.) এবং হীলা মাদরাসা যেন সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছিল। এ প্রতিষ্ঠানে তিনি যোগদানের পর থেকে বোখারী শরীফ উভয় খণ্ডের পাঠদান করে আসছিলেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময় হেদায়া, সিরাজী, নুরুল ইজাহ প্রভৃতির দরস প্রদান করেন।

তাঁর জীবনের কিছু অলৌকিক ঘটনা :

তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে- সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ। প্রবাদ আছে, সুন্নাতের উপর দৃঢ়তা অনেক কারামতের উর্ধ্বে। তিনি সর্বদা দ্বীনের উপর এত শক্তভাবে অটল থাকতেন, যা দুর্বল ঈমানদারদের পক্ষে কল্পনা করাও রীতিমতো অসম্ভব। রাস্তাঘাটে যেখানেই সফর করতেন, নামাযের সময় হলে ঠিকই দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে নিতেন। এই বৃদ্ধ বয়সে ঠিকই আদায় করে নিতেন তাহাজ্জুদের নামায। শেষ বয়সে তিনি দাঁড়াতে পারতেন না। অন্যের সাহায্যে চলাফেরা করতেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে- নামাযের সময় হলেই তিনি সুস্থসবল মানুষের মত ঠিকই দাঁড়িয়ে যেতেন এবং নামায আদায় করে নিতেন। কিন্তু নামায সমাপ্ত হওয়ার পর আর দাঁড়াতে সক্ষম হতেন না। সম্প্রতি সিএইচসিআর হাসপাতালে হুজুরকে যেখানে রাখা হয়েছিল, সেখানে আযানের শব্দ পৌঁছত না। কিন্তু আযানের সময় হলে যেন তাঁকে

কুদরতীভাবে জানিয়ে দেয়া হতো।

সন্তান-সন্ততি :

বর্তমানে হুজুরের জীবিত সন্তান-সন্ততির সংখ্যা, ৯ পুত্র ও ৬ মেয়ে। তন্মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহমান ও মাওলানা আব্দুল আজীজ বর্তমানে হীলা মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। মাওলানা আতাউর রহমান, তিনি দুবাইপ্রবাসী। মাওলানা হাবীবুর রহমান বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত আছেন। হুজুরের অন্য ছাহেবজাদারা হলেন, মাহবুব, আতিক, আব্দুল্লাহ, আব্দুল কুদ্দুস, ও ইমরান।

ইন্তিকাল ও জানাযা :

তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানান, গত ৮ জুলাই সোমবার আসরের নামাযের জন্য অজুরত অবস্থায় আকস্মিক তিনি ঢলে পড়েন। সে দিন থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রম অবনতি ঘটতে থাকলে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কক্সবাজার আল-ফুয়াদ হাসপাতাল হয়ে ১৬ জুলাই চট্টগ্রাম সিএসসিআর ক্লিনিকে চিকিৎসা দেয়া হয়। চিকিৎসকদের দেয়া তথ্য মতে, বয়োবৃদ্ধাবস্থায় তিনি রক্তশূন্যতা, হার্ট ও উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। কিছুদিন তাকে চট্টগ্রামের সিএসসিআর ক্লিনিকের নিবিড় পর্যবেক্ষণে (আইসিইউ) রাখা হয়। শেষ পর্যন্ত গত ২৪ জুলাই বুধবার দুপুর আড়াইটায় পুরো মুসলিম উম্মাহকে ইয়াতীম করে তিনি পরপারের উদ্দেশে পাড়ি জমান। হুজুর ইন্তিকাল করেন দুপুর আড়াইটায়। তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে পুরো হীলাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। হুজুরের ছাত্র ভক্তদের আহাজারীতে ভারী হয় আকাশ-বাতাস। সর্বস্তরের তৌহিদী জনতা জড়ো হতে থাকে হীলা মাদরাসায়। হুজুর সিএসসিআরে ইন্তেকাল করার পর পটিয়া মাদরাসায় গোসল ও কাফন দেওয়া হয়। এরপর যখন পটিয়া মাদরাসা থেকে হীলা নিয়ে আসা হচ্ছিল, তখন পথে পথে জনতার ঢল নেমেছিল। ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জামিয়া লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে। জোহরের পর যখন লাশ জানাযার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন পুরো হীলায় জনতার ঢল নেমেছিল। যেদিকে চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। পুরো জানাযার মাঠে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের নেতাকর্মীগণ, রাজনৈতিকবৃন্দ, সকল মতের উলামা-মাশায়েখের অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন শ্রেনী পেশার ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি, লক্ষাধিক মানুষের এমন জানাযার নামায পুরো দক্ষিণাঞ্চলে কখনো অনুষ্ঠিত হয়েছে কি না তা এলাকার বৃদ্ধরা পর্যন্ত স্মরণ করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। ঠিক দুপুর আড়াইটাই হুজুরের সুযোগ্য বড় সাহেবজাদা, হীলা দারুসসুন্নাহর সুযোগ্য শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রহমানের ইমামতিতে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তাঁকে তার পারিবারিক কবরস্থানে মরহুম আলহাজ্ব শাহ আবুল মনজুর (রহ)-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

এভাবেই ঝরে গেল আজিজী কাননের সর্বশেষ পুষ্পটিও, যে ফুলের সৌরভে মুখরিত হয়েছিল দেশ-বিদেশ, যার সুগন্ধি মুগ্ধ করেছিল পুরো মুসলিম উম্মাহকে।

বাংলাদেশ মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে হারিয়েছে শায়খুল হাদীস আল্লামা আযিযুল হক, আল্লামা ইসহাক গাজী, আল্লামা মুফতী আহমদুল হক্ব (নায়েবে মুফতী সাহেব রহ.), আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম, মুফতি ফজলুল হক আমিনী, আল্লামা শাহ আইয়ূব (রহ.), আল্লামা নুরুল ইসলাম জদীদ, আল্লামা মু'তাসীম বিল্লাহ প্রমুখ প্রতিথযশা ব্যক্তিদের। ধারাবাহিক সেই মৃত্যুর মিছিলে সবশেষে যুক্ত হলেন আকাবিরদের মূর্ত প্রতিচ্ছবি, সদা হাস্যোজ্জ্বল নূরানী চেহারার অধিকারী, ব্রিটিশ-পাক-বাংলা আমলের অসংখ্য উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষদর্শী, জীবন্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, শায়খুল হাদীস আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক সদর সাহেব (রহ.)। উত্তরসুরিদের সামনের খোলা পথে ঘোর অমানিশার হাতছানি; এক-এক করে নিভে যাচ্ছে প্রদীপ; পরপারের যাত্রীদের কাফেলা হচ্ছে ভারী। যারা বিদায় হয়ে যাচ্ছেন তাঁদের আসন পূরণ হবে কি না জানি না। সদর সাহেব হুজুরকে হারানোর বেদনায় অস্থির হাজার হাজার ওলামা-মাশায়েখ ও অসংখ্য গুণগ্রাহী আম-জনতা।

পরিশেষে, হে আল্লাহ! হে মহা-মহিম! আপনার এই প্রিয় বান্দাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন!

আমরা মাসিক আল-আবরার পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর, আন্তরিক সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সবরে জামীল দান করুন। আমীন।

হযরত আল্লামা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ (রহ.)

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

দেশের প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ, হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর অন্যতম শাগরিদ, ঐতিহ্যবাহী জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগের মুহতামিম আল্লামা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ আর নেই। ১৫ জুলাই ৬:৪৫ মিনিটে তার ইন্তেকাল হয়। বিগত দুই-আড়াই বছর যাবত তিনি শারীরিক নানান রোগে ভুগছিলেন। দীর্ঘ কয়েক মাস ছিলেন শয্যাশায়ী।

জন্ম ও বংশ :

তিনি ১ আষাঢ় ১৩৪০ বঙ্গাব্দে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার গোপালপুরের সম্ভ্রান্ত 'কাজী' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

জন্মের পর নাম রাখা নিয়ে হয় মতপার্থক্য। বাবা-মা নাম রাখেন 'মুতাসিম বিল্লাহ'। দাদি নানি রাখেন 'বাহার'। নানা রাখেন 'বাহরুল উলুম'। এরপর প্রথম উস্তাদ মাওলানা তাজাম্মুল আলি (রহ.) রাখেন 'কাজী মুতাসিম বিল্লাহ বাহার'। বর্তমানে তিনি 'কাজী সাহেব' নামে পরিচিত। 'কাজী' উপাধি পারিবারিকভাবেই স্বীকৃত। পরদাদা, বাপ-দাদা সবাই কাজীর দায়িত্ব পালন করেছেন শুরু থেকেই।

বাবা মাওলানা কাজী সাখাওয়াত হুসাইন (রহ.) ছিলেন বিচক্ষণ আলেম ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ। দাদা মাওলানা কাজী আবদুল ওয়াহেদ ও পরদাদা কাজী রওশন আলী (রহ.) ছিলেন প্রখ্যাত পীর। নানা গোপালপুরের পীর বংশের মাওলানা মাকবুলুল হক সিদ্দিকি ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ও কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সমর্থক।

শিক্ষা দীক্ষা :

পারিবারিক ঐতিহ্যনুযায়ী বাবা-মায়ের কাছেই তার প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। গাঁয়ের স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে চলে আসেন নানাবাড়ি। প্রাইমারি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি পড়ে যশোরের লাউড়ি আলিয়ায় ভর্তি হন। লাউড়ি আলিয়া মাদরাসায়ই ফাজিল শেষ করেন।

উচ্চশিক্ষা :

১৯৫৩ সালের রমাজানের পর তিনি ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে 'ফুনুনাত ও মাওকুফ আলাইহি' বিভাগে ভর্তি হন। এরপর ১৯৫৬ সালে দাওরায়ে হাদিসে ভর্তি হন।

বৈবাহিক জীবন

১২ জুন ১৯৫৯ সালে মাগুড়া কলেজ পাড়ার শাহ সুফি হাজি আবদুল হামিদ (রহ.)-এর কন্যাকে তিনি বিয়ে করেন।

সন্তান-সন্ততি

পারিবারিক জীবনে তিনি চার ছেলে ও এক মেয়ের জনক।

কর্মজীবন

তিনি এক বর্ণাঢ্যময় কর্মজীবনের অধিকারী ছিলেন। কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরে ঐতিহ্যের ছাপ রেখেছেন অত্যন্ত সুনাম ও মর্যাদার সঙ্গে। শিক্ষকতা ঘিরেই তার কর্মজীবন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; তাকে করেছে মহিমান্বিত।

শিক্ষকতা :

১৯৫৭ সালে দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে তিনি ছেলেবেলার সেই আলিয়ার অধ্যাপনায় যোগ দেন। ১৯৫৯ সালে বড়োকাটা মাদরাসায় মুহাদ্দিস ও ১৯৬২ সালে জামিয়া ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালের শেষের দিকে মোমেনশাহীর কাতলাসেন আলিয়ায় প্রধান মুহাদ্দিস ও ১৯৬৯ সালে জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি সেখানে দীর্ঘ আট বছর মুহতামিম ও শাইখুল হাদিস ছিলেন। এরপর ১৯৭৭ সালে পুনরায় মোমেনশাহীর কাতলাসেনের আলিয়ায় যোগ দেন। ১৯৭৯-৮০ সালের মাঝের এক বছর তিনি মিরপুরের জামিয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদে মুদাররিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগে মুহতামিম পদে নিযুক্ত হন। ১৯৯২ সালের শুরুর দিকে তিনি যশোরের দড়টানা মাদরাসায় মুহতামিম ও শাইখুল হাদিস পদে যোগ দেন। ১৯৯৪ সালে তাঁতি বাজারের জামিয়া ইসলামিয়ায় মুহতামিম ও শাইখুল হাদিস পদে যোগ দেন। ১৯৯৭ সালে পুনরায় মালিবাগ জামিয়ায় মুহতামিম ও শাইখুল হাদিস পদে যোগ দেন। অদ্যাবধি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়াও ১৯৮০ সালে যখন জামিয়া মালিবাগে মুহতামিম ছিলেন, তখনকার কোনো এক সময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (খণ্ডকালীন শিক্ষক) পদে

যোগ দেন। নিয়োগ ছিল ছয় মাসের। কিন্তু থাকতে হয় দেড় বছর। এরপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ইস্তফা দিয়ে চলে আসেন।

সাহিত্যচর্চা

তিনি বাংলাদেশের সুসাহিত্যিকদের একজন। তার রচনা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব রসবোধে সিক্ত। বাংলা, আরবী ও উর্দু-ফার্সি সাহিত্যের শত শত কবিতার পঙ্‌ক্তি তার ঠোঁটস্থ ছিল। সাহিত্যমানে তার রচনা অনেক উঁচুমানের ছিল।

লেখালেখি

বাংলা ভাষায় তার রয়েছে একাধিক মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত বহু তাফসির, হাদিস ও ধর্মীয় গ্রন্থের নিখুঁত সম্পাদনা করেছেন তিনি। ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত আল কুরআনুল কারিম ও সিহাহ সিত্তা গ্রন্থাবলীর টিকা-অনুবাদ এবং বিশ্বকোষের সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। বাংলার পাশাপাশি তিনি উর্দু ভাষারও একজন সুসাহিত্যিক। দেওবন্দে পড়াকালে শেষ বছরের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় 'মওজুদাহ আলমি কশমকশ আওর উসকা হল' নামে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন তিনি।

রচনা ও অনুবাদ

তার রচিত গ্রন্থের মাঝে রয়েছে- 'ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ', 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সুর' {১ম ও ২য় খণ্ড} ও 'জমিয়ত পরিচিতি'। তার অনূদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে- 'কিতাবুল আদব', 'তানভিরুল মিশকাত' (৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ডের টিকাসহ অনুবাদ}, হেদায়া (৪র্থ খণ্ডের 'কিতাবুল ওসায়া'-এর অনুবাদ} ও 'মসজিদের মর্মবাণী'।

অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলি

'রদ্দে মওদুদিয়্যাত' ও 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সুর'-এর বাকি অংশ।

তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি

তিনি ১৯৫৭ সালে ফারেগ হয়ে মাদানি (রহ.)-এর হাতে বাইয়াত হন। সে বছরের ৫ ডিসেম্বর মাদানি (রহ.)-এর ইন্তিকালে দেশে ফিরে আসেন। উস্তাদ তাজাম্মুল আলি (রহ.)-এর কাছে বাইয়াত হয়ে তাসাওউফের উচ্চমার্গে উপনীত হন। তিনি তাকে ইজাযত প্রদান করেন।

রাজনীতি

ছাত্রজীবনে কখনও তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তবে বাবা, দাদা ও নানা জমিয়ত ও কংগ্রেসের সক্রীয় কর্মী ছিলেন। তাই তিনিও কর্মজীবনের শুরুতেই জমিয়তের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৬ সালে তিনি অল পাকিস্তান জমিয়তের কেন্দ্রীয় এবং গঠনতন্ত্র প্রনয়ণের সাব কমিটির সদস্য হন।

সমাজসেবা

১৯৭১ সালে যুদ্ধোত্তর ভেঙে পড়া বাঙালি মুসলিম ও ওলামায়ে কেরামের কল্যাণে তার অবদান চির স্মরণীয়। যুদ্ধের পর বাঙালি মুসলিমের এক বিরাট অংশ মনে করলেন, ভারত নিয়ন্ত্রিত সেক্যুলার সরকারের হাতে তাদের ঈমান ও ইসলাম ভূলুণ্ঠিত হবে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তিনি হ্যান্ডমাইক নিয়ে এ দেশের গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে, মসজিদ থেকে মসজিদে ঘুরে বেড়ান। ভেঙ্গেপড়া মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'মুসলমান! তুমি যদি সত্যিকার মুসলমান হও, তাহলে নজরুল-তাজউদ্দিন সরকার তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' এছাড়াও শেখ মুজিবুর রহমান যখন প্রেসিডেন্ট, তাকে বলেছিলেন, 'এদেশের সাধারণ ওলামায়ে কেরাম স্বাধীনতার বিরোধিতা করেননি। কাজেই তাদেরকে হয়রানি বন্ধ করার নির্দেশ দিন।' শেখ মুজিব তখন তাকে কথা দিয়েছিলেন।

অন্তিম কথা

'আমি কাজী মুতাসিম বিল্লাহ (পিতা : মাওলানা কাজী সাখাওয়াত হুসাইন রহ. ঝুমঝুমপুর, কোতয়ালি, যশোর) সজ্ঞানে দীনি আমানত হিসেবে আমার ছাত্র, মুতাআল্লিকিন, মুহিব্বিন ও সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে এ মর্মে অসিয়ত করছি যে, আমার মৃত্যুর পর আমার কোনো কথা ও লেখা দ্বারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত তথা দেওবন্দি আকাবিরের চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগ নেই। সকল বাতিল ফিরকা বিশেষকরে মওদুদি-জামায়াত, শিরক, বিদআত ও মিলাদ-কিয়াম সম্পর্কে দেওবন্দি আকাবিরের যেই মতামত, আমারও সেই মত। রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা ও আদর্শগতভাবে আমি আমার উস্তাদ ও মুরশিদ শাইখুল ইসলাম হজরত মাদানি (রহ.)-এর অনুসারী। এতে কারও কোনো আপত্তি আমার কাছে গ্রহণীয় নয়। অতএব, কেউ যদি আমার দিকে ভিন্ন কোনো মতাদর্শ সম্পর্কিত করেন, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। আমার ছাত্র, ভক্ত-অনুরক্ত ও সকল মুসলমানকে আমি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকিদার অনুসারী হওয়ার আবেদন করছি।'

(সূত্র: নতুনখবর.কম/মাকা)

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : কবর পাকা করা

মুহা: আব্দুল মান্নান
দিনাজপুর

জিজ্ঞাসা:

জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী ডেলিভারির সময় মারা যান এবং তার সন্তানকে দুনিয়ার বুকে রেখে যান। এখন সে স্ত্রীর কবরকে পাকা করে দিতে চান যেন পরবর্তীতে তার সন্তান মায়ের কবর চিনতে পারে এবং যিয়ারত করতে পারে। এমতাবস্থায় কবর পাকা করা যাবে কি না? উল্লেখ্য যে, উক্ত কবরটি ওয়াকফকৃত কবরস্থানের মধ্যে।

সমাধান:

কবর পাকা করা শরীয়তসম্মত নয়। তবে বিশেষ কারণে যথা কবরের চিহ্ন ও সংরক্ষণ সম্মান বজায় রাখার জন্য কবরের যেকোনো পার্শ্বে নেইম প্লেট দেয়া। মাথার সীমানায় মুঠহাত উঁচু করে ওয়াল করা যেতে পারে। (রদ্দুল মুহতার ২/২৩৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/১৯৯)

প্রসঙ্গ: মাদরাসা ফান্ড

মুহা: এম. এ হালিম
উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২

জিজ্ঞাসা:

ওয়াকফকৃত মসজিদের অতিরিক্ত জায়গার দ্বিতীয় তলায় মাসিক ভাড়া প্রদান সাপেক্ষে (ভাড়া ১০০০) একটি এতিমখানা ও হিফজ বিভাগ চলিতেছে। বর্তমান মসজিদের নির্মাণ কাজ চলিতেছে কিন্তু ফান্ডে টাকা নেই। উল্লেখ্য যে উক্ত মাদরাসা ও এতিমখানার ফান্ডে পর্যাপ্ত টাকা আছে। ফেরত প্রদানের শর্তে কিছু দিনের জন্য মাদরাসা ও এতিমখানার ফানআড থেকে মসজিদের নির্মাণকাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করা যাবে কি না?

সমাধান:

শরীয়তের দৃষ্টিতে মাদরাসা ফান্ডের টাকা অন্য কাউকে কর্জ দেয়া অনুচিত। তবে উসূল হওয়ার নিশ্চয়তা থাকলে তখন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে মসজিদকে কর্জ দেওয়ার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত মাদরাসা ও এতিমখানার ফান্ড থেকে মসজিদের নির্মাণকাজের জন্য সাময়িকভাবে ঋণ দেয়া যেতে পারে। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪৪৩, মাহমুদিয়া ১/৪৯১)

প্রসঙ্গ: তারাবীহর নিয়ত

মুহা: ছাব্বির আহমদ
মাহমুদনগর, সাইন বোর্ড মাদরাসা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা:

আমি ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে বিশ রাকা'আত তারাবীহ নামায আদায় করছি। এই মুতলাক নিয়তের পরে দুই দুই রাকাত করে বিশ রাকা'আত নামায আদায় করেছি এমতাবস্থায় নামায আদায় হবে কি না?

সমাধান:

প্রশ্নে বর্ণনা মতে তারাবীহর নামাযের শুরুতে বিশ রাকা'আতের নিয়ত করার দ্বারা নামায সহীহ হয়ে যাবে। তবে প্রত্যেক দুই রাকা'আতের শুরুতে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ত করা উত্তম। (হিন্দিয়া ১/৬৫, আল বাহরুর রায়িক্ব ১/২৭৮)

প্রসঙ্গ: বাংলা হাদীস ও তাফসীর পাঠ

মুহা: ফুরকান
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

জিজ্ঞাসা:

হাদীসের কিতাব এবং কুরআনের তাফসীরকে আরবী থেকে বাংলায় অনুবাদ করার কারণে ইসলামী জ্ঞানশূন্য বাংল-ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন করার সহজ একটি ব্যবস্থা। এখন আমার প্রশ্ন হলো, হাদীস বা তাফসীরের কোনো অনুবাদ সাধারণ লোকদের জন্য পড়া বৈধ হবে কি না? উল্লেখ্য প্রশ্নের কারণ হলো, এক ইংরেজি শিক্ষিত লোক কুরআনের বাংলা অনুবাদ পড়ার পর ইসলামের সমালোচনা করে যে, মৌলবীদের মধ্যে এত মতভেদ কেন? দলিল স্বরূপ কুরআনের আয়াত صلوا عليه وسلموا تسليما দ্বারা মিলাদ কেয়াম বৈধ বলে দাবি করে কেননা صلوا দ্বারা কিয়াম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরেক ইংরেজি শিক্ষিত বাংলা ইতিহাস পড়ে ঈদে মিলাদুন্নবী বৈধ হওয়ার দাবি করে।

সমাধান:

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কুরআন-হাদীসের তথ্য-জ্ঞান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি শিক্ষা করা প্রয়োজন। তাই হক্কানী ওলামায়ে কেরামের লিখিত গ্রহণযোগ্য তাফসীর বা হাদীসের যেকোনো ব্যাখ্যা গ্রন্থ বিজ্ঞ আলেমের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক মুসলমানের অধ্যয়ন করা অত্যাবশ্যক। তবে ব্যখ্যা সাপেক্ষে

আয়াত হাদীস বা মাস'আলা-মাসাঈলের ক্ষেত্রে গবেষণা ও পর্যালোচনা করা কুরআন-সুন্নাহর অভিজ্ঞ উলামাদেরই একমাত্র অধিকার অন্য কারো নয়। তাই যেকোনো সাধারণ লোকদের জন্য কুরআন-হাদীসের শাব্দিক অর্থ বা তাফসীর দেখে মাস'আলা বের করার চেষ্টা করা চরম বোকামি ও পথভ্রষ্টের আলামত ছাড়া আর কিছুই নয়। তা ছাড়া। صـــلـــو শব্দের ব্যাখ্যা কোনো কিতাবে বা অভিধানে কিয়াম দ্বারা করা হয়নি। এ ধরনের ভিত্তিহীন মনগড়া কথা আলোচনা যোগ্য নয়। এটি কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১২/৪৯)

প্রসঙ্গঃ মাগরিবের আযানের পর ওয়াজ করা

মুহা: মাহমুদ
উত্তরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসাঃ

সম্প্রতি কোনো এক মসজিদে মাগরিবের আযানের পর ইকামতের পূর্বে মসজিদের ইমাম সাহেব একটি নতুন প্রথা উদ্ভাবন করে মুসল্লীদের উদ্দেশে ওয়াজ-নসিহত করে আসছেন। উক্ত ওয়াজ গত ১৭-৬-০৭ ইং তারিখ থেকে চলে আসছে। ইমাম সাহেব, কোনো এক মুসল্লীকে এই নতুন প্রথার কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বলেন, ইহা মুসল্লীদের জানার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। নামায ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে মুসল্লীদের উদ্দেশে নতুন উদ্ভাবিত ওয়াজ নসিহতের বৈধতার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত কী?

সমাধান :

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে মাগরিবের নামাযের সময় তুলনামূলক সংকীর্ণ। যার কারণে শরীয়তে মাগরিবের আযানের পর পরই নামায আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই সমস্ত ইমাম ও ফেকাহবিদগণ মাগরিবের আযানের পর বিলম্ব না করে ফরয নামায আদায় করার উপর জোর দিয়েছেন। এবং বিলম্ব করাকে মাকরুহ বলেছেন। অন্যদিকে মাগরিবের আযানের পর ইকামতের পূর্বে মুসল্লীদের উদ্দেশে ওয়াজ নসিহত করার প্রথা ইসলামের সোনালি যুগ হতে এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত ওয়াজ নসিহতের নব আবিষ্কৃত পদ্ধতি পরিহার করা জরুরি। (আবু দাউদ ১/১৮২, ফাতহুল বারী ২/৯০)

প্রসঙ্গঃ কবরস্থান

মুহা: কে এম সিরাজুল হক
উত্তরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসাঃ

আমাদের মসজিদের পার্শ্বেই মালিকানাধীন কবরস্থান। মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য আমরা মসজিদের সাথে লাগিয়ে কবরস্থানের উপর ঘর তৈরি করতে পারব কি না সে ঘর হয়তো আমরা মসজিদের অংশ হিসেবে ব্যবহার করব অথবা ইমাম ও মুয়াজ্জীনের থাকার ব্যবস্থা করব এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

সমাধানঃ

যেহেতু কবরের উপর ঘর ইত্যাদি নির্মাণ করা হাদীসের আলোকে নিষেধ বিধায় দাফনের কাজে ব্যবহৃত কবরস্থানের উপর ছাদ দিয়ে উপরে কিছু করা শরীয়তের আলোকে বৈধ হবে না। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মালিকানাধীন দাফনের কাজে ব্যবহৃত কবরস্থানের উপর ছাদ নির্মাণ করে সেখানে মসজিদ সংক্রান্ত কোনো কর্মকাণ্ড করার অনুমতি দেয়া যাবে না। তবে মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানে দাফনকৃত লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে মালিকের অনুমতিক্রমে নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গাকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। (তিরমিজী শরীফ ১/২০৩,খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২২৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৬/৪০৯)

প্রসঙ্গঃ পাত্রি দেখানো

মুহাম্মদ নুরুদ্দীন
হবিগঞ্জ।

জিজ্ঞাসাঃ

বিভিন্ন হাদীসের দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদেরকে বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখতে তাগিদ দিয়েছেন। এ অনুযায়ী বর্তমানে অনেক উলামায়ে কেরামও আমল করেন। আর তা বিবাহের পূর্বেই তারিখ ঠিক করে অনেক মুফতীদেরকে দেখতে দেখা যায়। এদিকে হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ও হযরত থানভী এবং হযরত রশীদ আহমদ লুধিয়ানুভী (রহ.)সহ আরো অন্যান্য আকাবেরদের মতে উপরোল্লেখিত পদ্ধতিতে পাত্রী দেখা মানবতার মানহানি এমনকি অবৈধও বুঝা যায়। বি.দ্র. যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম তারিখ ঠিক করে দেখেন তারা সেটাকে সঠিক জানার সাথে সাথে দলিলও পেশ করেন যে আমাদের জন্য জায়েয। নাজায়েযের ফাতাওয়া জনসাধারণের জন্য।

সমাধানঃ

বিবাহের পূর্বে পাত্রের জন্য পাত্রী

দেখা শরীয়তে জায়েয। এ ক্ষেত্রে আলেম আর সাধারণ লোক সকলের জন্য একই হুকুম। হাদীসের মধ্যে বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখে নেয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হলেও তারিখ ঠিক করে আনুষ্ঠানিকভাবে পাত্রী দেখানোর ব্যবস্থা করার প্রমাণ শরীয়তে নেই। তাই পাত্রের জন্য আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে পাত্রী দেখা বা দেখানোর ব্যবস্থা করাকে বৈধ বলা যাবে না। তবে নিজ মা বা মাহরাম মহিলাদের মাধ্যমে পাত্রী দেখে নেওয়া অথবা জায়েয কৌশল অবলম্বন করে দেখে নেওয়াই হবে উচিত। এতে হাদীসের মর্মও সঠিক থাকে ও মুফতীয়ানে কেরামের অবৈধের ফাতাওয়াও সহীহ থাকে। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩৭০,আল বাহরুর রায়িক্ব ৮/১৯২,আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৫২)

প্রসঙ্গঃ কবলাল জুমু'আ সুন্নাত

মুহা: এহসানুল হক
মিরপুর-১৩, ঢাকা।

জিজ্ঞাসাঃ

শরীয়তের দৃষ্টিতে কবলাল জুমু'আ ৪ রাকা'আত সুন্নাত নামাযের গুরুত্ব কতটুকু? কোনো খতীব বা ইমাম সাহেব যদি খুতবার আগে স্বল্প সময়ের জন্য গার্মেন্টস চাকুরিজীবি মুসল্লীদের কবলাল জুমু'আ ৪ রাকা'আত সুন্নাত পড়ার সুযোগ না দেয়ার কারণে উক্ত মুসল্লীগণ নিয়মিতভাবে কবলাল জুমু'আ ছেড়ে দেয়ায় অভ্যস্ত হন তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার হুকুম কী?

সমাধানঃ

শরীয়তের দৃষ্টিতে কবলাল জুমু'আ ৪ রাকা'আত নামায পড়া সুন্নাত মুআ'ক্কাদাহ, যা একান্ত করণীয়। কোনো শরয়ী উজর ছাড়া ছেড়ে দেয়া গুনাহ। না পড়ার অভ্যস্তদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে তাই ইমাম সাহেবের জন্য খুতবার নির্দিষ্ট সময়ের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত মুসল্লীদের সুন্নাত পড়ার সুযোগ দেয়া উচিত। এবং নির্দিষ্ট সময়ে খুতবা দেয়াতে কেউ সুন্নাত পড়তে না পারলে সে নামাযের পরে পড়ে নিবে। উল্লেখ্য যে ওয়াজ-নসিহতের দরুন সুন্নাতের সুযোগ না দিলে ইমাম সাহেব গোনাহগার হবেন। (কাশফুল হাকায়েক ১/৬৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৪৫৬)

প্রসঙ্গঃ বদলি হজ্ব

মুহা: আবুল কালাম আজাদ
ইমাম, থানা মসজিদ, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

জিজ্ঞাসাঃ

একজন হাফেয আলেম সাহেবকে যিনি নিজের হজ্ব আদায় করেছেন এবং হজ্বের বিষয়ে ভালো অভিজ্ঞতা রাখেন সাধারণ দ্বীনদার এক ব্যক্তি যাবতীয় খরচাদি দিয়ে নিজের বদলি হজ্বের জন্য পাঠান। তবে হজ্বে ইফরাদ বা অন্য কোনো প্রকার হজ্বের কথা উল্লেখ করেননি। তাই আহসানুল ফাতাওয়া ৪র্থ খণ্ডের বক্তব্য অনুযায়ী (বদলী হজ্বে) যেহেতু তামাত্তু ও জায়েয এবং উরফে-প্রচলনে এর অনুমতি স্বীকৃত তাই তিনি হজ্বে তামাত্তু করেছেন। এখন কেহ কেহ বলতেছেন তার বদলি হজ্ব আদায় হয়নি।

সমাধানঃ

বদলি হজ্বের ক্ষেত্রে ইফরাদ হজ্ব করাটাই শরীয়তের আসল বিধান এতদসত্ত্বেও বদলি হজ্বে প্রেরণকারীর অনুমতিক্রমে কিরাণ/ তামাত্তু হজ্ব করলেও অনেক ফেকাহবিদদের মতে হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। তবে প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে কোনো ধরনের নির্দেশনা পাওয়া না গেলে যেহেতু বর্তমান সমাজে সাধারণত প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার হজ্ব করার অনুমতি স্বীকৃত, বিধায় এমতাবস্থায় প্রেরিত ব্যক্তি প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে তামাত্তু হজ্ব করে ফেললে শরীয়তের দৃষ্টিকোণে তার হজ্ব বৈধ বলে বিবেচিত হবে এবং বদলি হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। যারা আদায় হবে না বলে তাদের কথা সঠিক নয়। (আদ্দুররুল মুখতার ২/৬১১, বাহরুর রায়িক্ব ৩/৬৬)

প্রসঙ্গঃ ব্যাংকে ইমামতি

মুহা: মাহমুদুন্নবী
বাসাবো, ঢাকা।

জিজ্ঞাসাঃ

আমাদের দেশে যে সমস্ত ব্যাংক চালু আছে এর অফিসে নামাযের ব্যবস্থা আছে। উল্লেখ্য যে এ সমস্ত ব্যাংকসমুহের মধ্যে অনেক সুদি ব্যাংকও আছে। তাই সে সমস্ত অফিসের মসজিদে ইমামতি করে বেতন গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

সমাধানঃ

যদি কোনো ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণটাই সুদভিত্তিক পরিচালিত হয় এমনকি উক্ত ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের মসজিদও সুদি টাকা দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে উক্ত মসজিদে ইমামতির বিনিময়ে বেতন নেওয়া জায়েয নেই। তবে উক্ত ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান যদি মসজিদের ইমাম সাহেবের বেতন অন্য কোন বৈধ ফান্ড থেকে দেয় অফিস স্টাফদের ব্যক্তিগত ফান্ড থেকে দেয়া হয় তাহলে ওই সমস্ত মসজিদে ইমামতি করে বেতন নেওয়া বৈধ হবে। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/১৪৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/২১)

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-৯

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

অপারগতাবশত জলসায়ে এস্তেরাহাত করা :

১। হযরত আবু উমামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

ان رسول الله ﷺ كان يوتر بتسع فلما بدَّن وكثر لحمه اوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس

"রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নয় রাক'আত বিতির পড়তেন। (তিন রাক'আত বিতির এবং ছয় রাকআত নফল) অতঃপর তাঁর (সা.) শরীর মোবারক ভারী হয়ে ওজন বেড়ে গেলে সাত রাক'আত বিতির (তথা তিন রাক'আত বিতির এবং ৪ রাক'আত নফল) আদায় করতেন এবং দুই রাকআত বসাবস্থায় আদায় করতেন। (তাহাবী শরীফ ১/২০৪)

২। হযরত আইয়ূব (রহ.) বলেন–

جاء نا مالك بن الحويرثؓ فى مسجدنا هذا فقال انى لاصلى بكم وما اريد الصلوة اصلى كيف رايت النبى ﷺ يصلى فقلت لابى قلابة كيف كان يصلى قال مثل شيخناهذا وكان الشيخ يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض فى الركعة الاولى

"হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস (রা.) আমাদের মসজিদে এসে বলেন, আমি তোমাদের সামনে নামায পড়ব। তবে আমার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তোমাদেরকে রসূল (সা.)-এর নামায পড়ার পদ্ধতি দেখানো, অন্য কিছু নয়। অতঃপর আমি আবু কেলাবাকে বললাম, নবী করীম (সা.) কিভাবে নামায পড়তেন? তিনি বলেন, আমাদের এই শায়খ যেভাবে নামায পড়ছেন সেভাবে। শায়খের (আদত ছিল) প্রথম রাক'আতে সিজদা থেকে উঠার পূর্বে বসতেন। (সহীহে বুখারী ১/৯৩)

দু'রাকআতের মাঝে রফয়ে ইয়াদাইন না করা :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كان رسول الله ﷺ اذا دخل فى الصلوة رفع يديه نحو صدره واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع ولا يفعل بعد ذلك

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায আরম্ভ করার সময় সিনা বরাবর হাত উঠাতেন এবং রুকুর প্রাক্কালে ও রুকু থেকে উঠার সময়ও হাত উঠাতেন। এর পর আর হাত উঠাতেন না। (আন্নাসেখ ওয়াল মানসূখ লি ইবনে শাহীন পৃষ্ঠা ১৫৩, ফতহুল বারী ২/২৮৬)

দ্বিতীয় রাক'আতের শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা :

عن ابن عمرؓ انه كان لايدع بسم الله الرحمن الرحيم قبل السورة وبعدها اذا قرء بسورة اخرى فى الصلوة۔

হযরত ইবনে উমর (রা.) নামাযে সূরায়ে ফাতেহার পূর্বে ও পরে সূরা পড়ার আগে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করতেন। (তাহাবী শরীফ ১/১৪৬)

প্রথম রাক'আত দীর্ঘ এবং দ্বিতীয় রাক'আত নাতিদীর্ঘ করা :

হযরত আবু কাতাদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كان النبى ﷺ يقرء فى الركعتين الاوليين من صلوة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول فى الاولى ويقصر فى الثانية ويسمع الاية احيانا وكان يقرء فى العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول فى الاولى وكان يطول فى الركعة الاولى من صلوة الصبح، يقصر فى الثانية۔

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুহরের নামাযের দুরাকআতে সুরায়ে ফাতেহা এবং দুটি সূরা পাঠ করতেন। প্রথম রাক'আতে দীর্ঘ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ছোট সূরা পাঠ করতেন। কোনো কোনো সময় আয়াত শুনিয়ে পড়তেন। আসরের নামাযে ফাতেহা এবং দুটি সূরা পড়তেন, প্রথম রাক'আত দীর্ঘ করতেন এবং ফজরের নামাযেও প্রথম রাক'আত দীর্ঘ এবং দ্বিতীয় রাক'আত ছোট করতেন। (সহীহে বুখারী ১/১০৫, সহীহে মুসলিম ১/১৮৫)

প্রত্যেক দু'রাক'আতে বসা:

হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلوة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ـــ وكان يقول فى كل ركعتين التحية۔

"রাসূলুল্লাহ (সা.) নামায আরম্ভ করতেন তাকবীর দ্বারা এবং কেরাত শুরু করতেন সূরায়ে ফাতেহা দ্বারা

এবং প্রত্যেক দু'রাক'আতে তাশাহহুদ পড়তেন। (অর্থাৎ বসা) (সহীহে মুসলিম ১/১৯৪, মুসান্নাফে আব্দুররাজ্জাক ২/১৩৪ হাদীস নং ৩০৮৬, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩/৪৭ হাদীস নং ৩০৪০)

প্রথম বৈঠকে বসার পদ্ধতি :

১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

انما سنة الصلوة ان تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى

"নামাযের সুন্নাত হলো তাশাহহুদে ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে বসা।" (সহীহে বুখারী ১/১১৪)

২। হযরত হুমাইদ আসসায়েদী (রহ.) নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামাযের নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

فاذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى

"তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'রাক'আত শেষে বসার সময় বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। (সহীহে বুখারী ১/১১৪)

৩। হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلوة بالتكبير ـــ وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরের মাধ্যমে নামায আরম্ভ করতেন এবং (তাশাহহুদের সময়) বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। (সহীহে মুসলিম ১/১৯৫)

প্রথম বৈঠকে শুধু তাশাহহুদ পড়া :

১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

علمنا رسول الله ﷺ ان نقول اذا جلسنا فى الركعتين التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন দু'রাক'আতের পরে বসবে তখন 'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু...' পুরোটা পড়বে। (নাসায়ী ১/১৭৪, আসসুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ২/১৪৮)

২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

علمنى رسول الله ﷺ التشهد فى وسط الصلاة وفى اخرها ـــ التحيات لله والصلوات والطيبات ـــ قال ثم ان كان فى وسط الصلوة نهض حين يفرغ من تشهد۔

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে নামাযের মাঝামাঝি এবং শেষে আত্তাহিয়্যাতু পড়া শিক্ষা দিয়েছেন...। তিনি বলতেন (প্রথম বৈঠকে) নামাযী তাশাহহুদ থেকে ফারিগ হওয়ার পরই দাঁড়িয়ে যাবে।" (মুসনাদে আহমদ ৪/২৩৮ হাদীস নং ৪৩৮২)

৩। হযরত হাসান (রহ.) বলতেন–

لايزيد فى الركعتين الاولين على التشهد

"নামায আদায়কারী প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ ছাড়া কিছু পড়বে না।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩/৪৭ হাদীস নং ৩০৩৮)

তাশাহহুদঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) বলেন–

كنا اذا صلينا خلف النبى ﷺ ـــ فقال ان الله هو السلام فاذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك يا ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ـــ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔

"আমরা যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে নামায পড়তাম তখন তিনি ইরশাদ করতেন, আল্লাহ তা'আলার নামই 'সালাম'। তোমরা যখন নামায আদায় করবে তখন এভাবে তাশাহহুদ পড়বে "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি...।"

তাশাহহুদের অর্থ :

সকল প্রশংসা, নামায এবং পবিত্রতা আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নবী ! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযোগী নয়। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। (সহীহে বুখারী ১/১১৫, সহীহে মুসলিম ১/১৭৩)

তাশাহহুদের সময় আঙুল দ্বারা ইশারা করা :

আলী ইবনে আব্দুর রহমান আলমাআবী (রহ.) বলেন, আমি নামাযে কঙ্কর নিয়ে খেলছিলাম, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) আমাকে দেখে বলেন–

اصنع كما كان رسول الله ﷺ يصنع، قلت كيف كان رسول الله ﷺ يصنع؟ قال كان اذا جلس فى الصلوة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التى تلى الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى۔

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমন করতেন তেমনই করো। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) কিরূপ করতেন? তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন,

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামাযে বসতেন তখন ডান হাত ডান রানের উপর রাখতেন এবং সকল আঙুল বন্ধ করে শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং বাম হাত বাম রানের উপর রাখতেন। (সহীহে মুসলিম ১/২১৬, সুনানে আবী দাউদ ১/১৪৯)

ইশারার পদ্ধতি :

হযতর আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

ان رسول الله ﷺ كان اذا قعد فى التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين واشار بالسبابة۔

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাশাহহুদের জন্য বসতেন তখন বাম হাত বাম পায়ের হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন এবং ডান হাত দ্বারা (৫৩) সংখ্যার আকৃতি গ্রহণ করতেন এবং শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন। (সহীহে মুসলিম ১/২১৬(

ইশারার সময় আঙুলকে নাড়াচাড়া না করা :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

ان النبى ﷺ كان يشير باصبعه اذا دعا و لا يحركها۔

"নবী করীম (সা.) তাশাহহুদের সময় আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং আঙুল নাড়াচাড়া করতেন না।" (সুনানে নাসায়ী ১/১৮৭, সুনানে আবী দাউদ ১/১৪৯)

শাহাদাত আঙুল নামায সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অনড়ভাবে বিছিয়ে রাখা :

আসেম ইবনে কুলাইব তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা শিহাব ইবনে মজনুন (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

دخلت على النبى ﷺ وهو يصلى وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه وبسط السبابة وهو يقول يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك

"আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি নামায আদায় করছেন। নবী করীম (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাম হাত বাম রানের উপর এবং ডান হাত ডান রানের উপর রেখেছেন। নবী (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শাহাদাত আঙুলকে বিছিয়ে রেখে 'ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব...' দু'আটি পড়ছিলেন। (জামেয়ে তিরমিযী ২/১৯৯)

তাশাহহুদের সময় দৃষ্টি শাহাদাত আঙুল বরাবর থাকা :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবীজি (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামায দেখেছি–

قال : لا يجاوز بصره اشارته

"বলেন, নবী করীম (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দৃষ্টি শাহাদাত আঙুলের সীমা অতিক্রম করত না।" (সুনানে আবী দাউদ ১/১৪৯, সুনানে নাসায়ী ১/১৭৩)

তাশাহহুদ অনুচ্চস্বরে পড়া :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

من السنة ان يخفى التشهد

"তাশাহহুদ অনুচ্চস্বরে পড়া সুন্নাত।" (সুনানে আবী দাউদ ১/১৪৯, জামেয়ে তিরমিযী ১/৬৫)

প্রথম বৈঠকে তাকবীর বলে দাঁড়ানো :

হযরত মুতাররিফ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

صليت انا وعمران بن حصينؓ صلوة خلف على بن ابى طالبؓ فكان اذا سجد كبر واذا رفع كبرواذا نهض من الركعتين كبر۔

"আমি এবং ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.)-এর সাথে নামায আদায় করেছি। তিনি সিজদার সময় তাকবীর বলতেন, সিজদা থেকে ওঠার সময় তাকবীর বলতেন এবং দুই রাক'আত শেষে ওঠার সময় তাকবীর বলতেন।" (সহীহে বুখারী ১/১১৪)

তৃতীয় রাক'আতের প্রারম্ভে রফয়ে ইয়াদাইন না করা :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كان رسول الله ﷺ اذا دخل فى الصلوة رفع يديه نحو صدره واذا رفع رأسه من الركوع ولا يفعل بعد ذلك

"রাসূল (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায আরম্ভ করার সময় সীনা পর্যন্ত হাত তুলতেন এবং রুকু থেকে ওঠার সময়ও হাত ওঠাতেন, এর পর এরূপ করতেন না। (আননাসেখ ওয়াল মানসূখ লি ইবনে শাহীন ১৫৩)

ফরজ নামাযে শেষ দু'রাক'আতে শুধু সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করা :

হযরত আবু কাতাদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

ان النبى ﷺ كان يقرء فى الظهر فى الاوليين بام الكتاب وسورتين وفى الركعتين الاخريين بام الكتاب۔

"নবী করীম (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুহরের প্রথম দুই রাক'আতে সূরায়ে ফাতেহা ও অন্য সূরা পড়তেন এবং শেষ দুই রাক'আতে শুধু সূরায়ে ফাতেহা পড়তেন। (সহীহে বুখারী ১/১০৭, সহীহে মুসলিম ১/১৮৫)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ

চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্ত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১